প্রথম প্রকাশ

ফাল্গুনী পূর্ণিমা

১৩৫৭

প্রকাশক

শ্রীনটরাজ কিশোর গোস্বামী

শ্রীগুরুরাজ কিশোর গোস্বামী

শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির

শ্রীভূমি

১০৭ ক্যানেল ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৪৮

মুদ্রাকর

শ্রীশ্যামকান্ত বসাক

প্রাণগৌর মুদ্রণালয়

৫৩, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড

কলিকাতা-৯

শিল্পী

শ্রীসতীন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী

ভারতবর্ষ, প্রাণগৌর, উজ্জীবন প্রভৃতি সাময়িক পত্রে কিছু কিছু প্রকাশিত ছিল কিছু নতুনও সংযোজিত হল।

গ্রন্থকার

লেখকের অন্যান্য বই

- বিলাপ কুসুমাঞ্জলি
- গোপাল সহস্রনাম
- সন্ধানীর সাধুসঙ্গ
- নিকুঞ্জরহস্যস্তব
- ভাগবত প্রবেশ
- গল্পে ভাগবত
- ভক্ত চরিত্র
- ঋষিবাক্য
- জ্ঞানেশ্বরী

পরিবেশক :—

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
২৮, বিধান সরনী,
কলিকাতা-৬

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

বসাক বুক ষ্টোর
৪, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

কথকতার কথা

বাংলার পল্লীশ্রী যে মহামাধুরী বহন করে সামাজিকের মনকে সরস করে রাখত, তার অনেকখানি ছিল সুর, সঙ্গীত ও কথার মাধ্যমে ভগবদুপাসনায়। নদীর ধারে বাঁশের ঝাড়। তার পাশ দিয়েই গ্রামের পথ একটানা চলেছে অনেক দূর। পথ আঁকা বাঁকা কত ছন্দে চলেছে দরদী বান্ধবীর মত। এই পথের দুধারে গ্রামের চোখজুড়ানো স্নিগ্ধশান্ত ঘনসন্নিবিষ্ট কাঁচা ঘরগুলি। মাঝে মাঝে গোয়ালে গরু, খোলা জমির উপর বাছুরের ছুটাছুটি। গ্রামের একপ্রান্তে মস্ত বড় অনেকদিনের পুরাণো একটা অশ্বত্থ গাছ, সেই গাছের ছায়ায় ভাঙ্গা সেকেলে ধবণেব একটি ঠাকুর ঘর আর বারোয়ারীতলা। এইখানে বছরের পর বছর কত গায়ক কত কথকচূড়ামণি এসে পালা গান করেন—কথকতা করেন। তখন আশেপাশের কত গ্রামের লোক এসে এইখানে তাদের প্রিয় হরিনাম শোনে, রামায়ণ শোনে, কৃষ্ণলীলা শোনে, তখন সে যে কি এক আনন্দের তরঙ্গ ওঠে তা বলে বুঝাবার নয়।

এখন অনেকদিন ধরে সেই অশ্বত্থ গাছের তলায় লোক আসে না—গান হয় না—কথকতাও শোনা যায় না। শুধু সেই পুরাণো ভাঙ্গা মন্দিরে বৃদ্ধ পূজারী বসে থাকেন—ঠাকুরের মুখ চেয়ে, আর ভাবেন মানুষের মন এমন হল কেন? তারা হরিনাম শুনতে চায় না, কথকতা[illegible]আদর করে না—মেলা মহোৎসবে তাদের আগের

মত আর উৎসাহ নেই। শুধু যত লোক কি কোথায় সিনেমায়—সেদিকেই ছুটে যাবে ?

বেশী দিনের কথা নয়, পঁচিশ বছর আগের কথাই বলি, তখনও দেশে ভালো ভালো কথক ছিলেন, যাদের মত গুণীলোক এখন আর দেখা যায় না। বাংলার পল্লীজীবন যারা রক্ষা করেছেন—রসে সঞ্জীবিত করেছেন—শুদ্ধ ভাবপ্রেরণায় নিয়ন্ত্রিত করেছেন এবং নিত্য নব ধর্ম্ম শিক্ষাদান করে জীবন গতিকে সহজ সরল সুস্থ রেখেছেন। সেই কীর্তনীয়া, কবির দল, কথকঠাকুর প্রভৃতি এখন বিরল দর্শন হয়েছেন। যারা ভাল গান করেন তারা সহরে, কবিরদল বিলুপ্তপ্রায়, কথক আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখন যারা ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত—প্রসঙ্গে জনচিত্তে আনন্দ-দানের ব্রত গ্রহণ করেছেন, তাঁরা প্রায়শঃ পাঠক বা ব্যাখ্যাতা। আগেকার দিনের মত কথকতা শুনতে চাইলেও উপায় আর নাই। এই ভাবস্রোত চলে চলে হয়তো কিছুদিনের পর সামাজিক কথকতার রস হতে একান্তভাবেই বঞ্চিত হয়ে যাবে। বৈষ্ণবাচার্য প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ একবার এই কথকতা সম্বন্ধে উন্নতিবিধায়ক কি উপায় অবলম্বন করা যায়, এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। তাতে এই বিদ্যার পুনরুজ্জীবনের নিমিত্ত প্রয়োজনবোধে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনেরও উপদেশ দিয়েছিলেন। প্রাচীন রীতিতে যাঁরা শিক্ষা-লাভ করেছেন, ভাগবত, রামায়ণ সম্বন্ধে, শুধু তাঁরাই এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হতে পারেন।

প্রসিদ্ধ কয়েকজন কথকের নাম করেই কথকতা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হলো এ কথা যেন কেউ মনে না করেন। কথকেরা

প্রায়শঃ কথা-সম্বল। সাহিত্যক্ষেত্রে তাদের দান খুব বেশী নয়। তবে একেবারে কোথাও কিছু নেই, এ কথা বলা তাদের প্রতি অন্যায় করা।

যে সব খ্যাতনামা কথক সহস্র সহস্র লোকের মনে কথার প্রাচুর্যে ভাবের বন্যা সৃষ্টি করেছেন—যাঁরা কবির কাব্যকে সার্থক করেছেন কণ্ঠের মাধুর্যে—যাঁরা ব্যাস বাল্মীকির বর্ণনাকে রূপ দিয়েছেন আঙ্গিক অভিনয়ে, যাঁরা পদাবলীকে মধুর ছন্দ দিয়েছেন পাঠক্রম চাতুর্যে, সেই কথকদের গৌরবকে চিরন্তন করে রাখবার মত কোনো সাহিত্য নেই কোনো ভাষা নেই কোনো অবলম্বন নেই আছে শুধু তাঁদের ছায়ামূর্তি বর্তমানের পাঠক ও ব্যাখ্যাতৃবর্গ। কিন্তু ইহাঁদের সংখ্যাও এত অল্প যে, উহা লোকশিক্ষার পক্ষে মোটেই প্রচুর বলে অস্বীকার্য।

গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, নিরক্ষর জনগণকে স্বাক্ষর করাবার জন্য নানারূপ পরিকল্পনা, অর্থব্যয় ও প্রচেষ্টা চলেছে স্বাধীন ভারতে প্রশংসনীয়ভাবে সন্দেহ নেই। কিন্তু অক্ষর পরিচয়েই মানুষের জীবনছন্দে অভাব মিটে না, একথা আজ আর কারুর অজানা নেই। লৌকিক শিক্ষার সঙ্গে প্রতিনিয়ত যেভাবে চাহিদার বৃদ্ধি হয়, সে কথা অনেকেই স্বীকার করেছেন। বৈদেশিক প্রভাব ভারতীয় মনের উপর তীব্র প্রতিক্রিয়া সুরু করেছে। মনের সন্তোষ চুরি করে সমাজের প্রতিটি স্তরে যে একটা অসন্তোষের আগুন ছড়িয়েছে ভোগলিপ্সা সেটিকে আর চাপা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সমাজহিতকামী নেতৃবৃন্দ আজ এই ভীষণ অবস্থার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কর্তে পারেন না; তার কারণ তাতে এদের

নৈতিক মৃত্যু অনিবার্য, আর যুদ্ধের সাহসও তাদের নেই। কেন না, তারা জানেন এই যুদ্ধে জয়ের আশার চাইতে পরাজয়ের শংকাই অধিক। তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের হাতে গ্রন্থাগার আছে, বিদ্যালয় আছে, ক্লাব সমিতি সঙ্ঘ আছে, গুপ্ত বা প্রকাশ্য আলোচনা কেন্দ্র আছে, দশজনে মিলিতভাবে আলাপ আলোচনা করে নিজে-দের হিতচিন্তার উপায় আছে, ব্যবস্থা আছে। ইহাদের সংখ্যা গ্রামে জনসমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করলে অতি নগণ্য। এই বিরাট সমাজের মনে যদি বিষবাষ্প ছড়িয়ে যায় তাকে রুদ্ধ করে কে?

গ্রামের ঠাকুরদালান ভেঙ্গে পড়লে মেরামত হয় না, কারণ বাবুরা কলকাতায় থাকেন। পুষ্করিণী পরিষ্কার হয় না, কারণ কর্তারা নতুন ব্যবসা দিয়েছেন, এদিকে তাদের নজর নেই। বারোয়ারী উৎসব গ্রামে বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ যারা মোটা চাঁদা দিতেন তারা এখন গ্রাম ছেড়ে সহরে বাস করছেন। কথকঠাকুর একবার করে এই গ্রামে প্রতি বছর আসতেন—এখন কয়েক বছর আর তাকে দেখা যায় না, কারণ যারা তাকে গ্রামে আন্‌তেন তারা এখন বালীগঞ্জে থাকেন। গ্রাম এখন অন্ধকার। পালেদের বাড়ীতে একটা মৃদঙ্গ ছিল, সেটি বাজাবার লোক নেই বলে পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে আছে। খঞ্জনীর ডোরীগুলি ছিঁড়ে গেছে। একতারা আর কেউ বাজায় না, কয়েকটা এস্‌রাজ আসর জমিয়ে রেখেছে। তবলার তেটে খেটে শোনা যায় মাঝে মাঝে, কিন্তু মৃদঙ্গের তাথৈ তাথৈ বোল আর কেউ মনে করে রাখে নি। শীলেদের বাড়ীতে মহাপ্রভুর মন্দির আছে। একপাশে কাপড়ে জড়ানো কতকগুলি কি পুঁথি আছে। অনেকদিন আগে তাদের গুরুদেব যখন

আসতেন, তিনি সেগুলি কখনো কখনো খুলে দেখাশুনা কর্তেন। তাতে আর কিছু না হোক্ বইগুলোর জমাটবাঁধা ধুলো কয়েকদিনের জন্য সরে যেতো। তিনি আর আসেন না গ্রামে, পুত্রটি আসেন বটে। এবেলা আসেন ওবেলা চলে যান। তাঁর নাকি গ্রামেব হাওয়া সহ্য হয় না। তিনি বই পুঁথির ধার ধারেন না। তিনি চাকরী করেন।

কথকতা হবে কোথায়? বারোয়ারীতলায় এখন অনেকদিন ধরে মাছের হাট বসে। তীব্রগন্ধে তার কাছ দিয়ে যাওয়া আসা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। গয়লাদের প্রশস্ত আঙ্গিনা আছে বটে, তাদের ভাইদেব ভেতর মতের মিল নেই। একজন বল্‌বে হোক— অমনি আর দু'জন বলবে হতে পারে না। ওসব বামুনদের লোক ঠকিয়ে নেবার ফন্দী আর চল্‌বে না। এদিকে নতুন সিনেমা হলটায় দুবার করে 'শো' নিয়মিতভাবেই চলেছে। একদিনও বন্ধ নেই— তাতে ক'রে প্রায়ই শোনা যায়, এবাড়ী ওবাড়ী করে ছোট ছোট দু'চারটি চুরি প্রতিনিয়তই চলেছে। দুষ্টু লোকেরা বলে ঐ সিনেমার জন্যই চুরি হচ্ছে।

মাঝে মাঝে যাত্রার দল এসে পূজা বাড়ীতে বা উৎসবের আঙ্গিনায় ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অম্বরীষের উপাখ্যান অভিনয়ে জনসাধারণের হৃদয়ে একটা সরস সজীবভাবের উল্লাস সৃষ্টি কর্ত্তে সমর্থ হতো এখন সে যাত্রার দল আর চলে না। তাদের পোষায় না, বুঝি সমাজ আরও উন্নত ধরণের কিছু আশা করে। সিনেমায় বাস্তব জীবনের ছবি কল্পনালোকের ছায়া দর্শন ক'রে সাময়িক তৃপ্তিলাভ হতে পারে কিন্তু প্রাণের ক্ষুধা বৃদ্ধি ভিন্ন সেখানে সন্তোষের কোনো সন্ধান

পাওয়া যায় না প্রায়শঃ। আমাদের বাড়ীর সেই প্রাচীন কথক-ঠাকুরকে দেখেছি। এ বাড়ীতে তাঁর পদার্পণে নতুন জীবনের সাড়া পাওয়া যেতো। গিন্নি-মায়েদের তো কথাই নেই, পাড়ার সব্বার একটা ভাবান্তর উপস্থিত হতো। সকলের মুখেই প্রশ্ন, কখন কথা সুরু হবে! সেই বৃদ্ধ কথকঠাকুর যেন একটা মস্তবড় বিস্ময়—যেন একটা মহামন্ত্র—যেন জনমোহকারী যন্ত্র। শুধু কি তাই? তিনি যেন চলন্ত শ্রদ্ধার মূর্তি। তাঁকে সম্মান করে সব্বাই। তার কাছে মাথা নোয়াতে কারুর সঙ্কোচ নেই। বালক বৃদ্ধ যুবা সকল স্তরের লোকের তিনি যেন অত্যন্ত নিকটতম প্রিয় বান্ধব। তাঁর হৃদয়ে যেন সকলকার জন্য প্রশস্ত স্থান করে রাখা হয়েছে। তার কাছে যেতে কুলের কুলবধূরও সঙ্কোচ নেই। ছোট ছেলে-মেয়েদের তো তিনি যেন একজন খেলার সাথী। সদা হাসিমুখ কথায় কথায় ভঙ্গী বিলাস—একটি কথায় সাতটি কথা—তিনি যেন গল্পের খনি। ছেলেরা এসেই বলে দাদু একটা গল্প বলুন। ছোট মেয়েরা এসে বায়না ধরে, একটা গান করুন। বৃদ্ধেরা এসে পরমার্থ প্রশ্ন করেন আর বলেন, তোরা ছোটরা এখানে কেন? যা যা খেলা করগে। তোরা ওঁর কথার কি বুঝবি? মেয়েরা বলাবলি করে, ঠাকুরমশায় এলে তার সঙ্গে নিরিবিলি দুটো কথা বলবো তার উপায় নেই। কোথা থেকে সব বুড়োর দল এসে জাঁকিয়ে বসলেন। কতক্ষণে উঠে যাবেন তার ঠিক নেই।

আমরা আর সময় পাবো কখন। এত বেলা হয়ে গেল, এক্ষুণি ঠাকুর যাবেন পূজার ঘরে। পূজা সেরে নিজে হাতে রান্না করে খাওয়া সে কি কম কষ্ট! আহা ঠাকুর যে কারুর জল পর্য্যন্ত

নেন না। আমাদের তো গোঁসাই গুরুর কাছে দীক্ষামন্ত্র হয়েছে, হলে হবে কি? বলেছিলুম—ঠাকুর আমরা তো দীক্ষিত। জল এনে মশল্লা তৈরী করে দিলে দোষ কি? ঠাকুর বলেন, না মা, তোমাদের দীক্ষা তো ঠিকই হয়েছে, তবে কিনা তোমরা তো আর যথাশাস্ত্র সদাচাব পালন কর না। যারা শৌচের নিয়ম মেনে চলে না, গুরুর আদেশে আমি তাদের হাতে জল খাইনে। ঠাকুরের কথায় মনে দুঃখ হয়। কত বামুন আমাদের রান্না খায়, আর উনি বলেন জলও খান না। কি জানি কার কি নিয়ম। তবে এ নিয়ম আর কতদিন চল্‌বে সেইটেই ভাববার বিষয়।

এই সেদিন আমাদের পাশের বাড়ীর এক ব্রাহ্মণ কন্যা দু'বছর আগে স্বামী হারিয়েছে। ছেলেমেয়ে তার কেউ নেই। কথক-ঠাকুরের সেবা যত্ন করে একটু ধর্ম করবে বলে এসে কত করে বল্‌লে। ঠাকুরের ঐ এক কথা আমি কারুর জল নেব না। এমন লোকও হয় এ কালে?

ঠাকুর নিরামিষ-ভোজী। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, আহার শুদ্ধ না হলে দেহ মন শুদ্ধ হয় না। মন শুদ্ধ না হলে কেমন করে কি হয়? শরীর আর মনই আমাদের যথাসর্বস্ব। দেহ যদি অপবিত্র হয়, মন পবিত্র থাকে না; আর মনটা যদি অপবিত্র চিন্তা করে, শরীরকে যতই পবিত্র রাখবার চেষ্টা কর না, সে শরীরও অপবিত্র। ভাবের ঘরে চুরি হলে সব অন্ধকার।

তিনি নাকি কথকতা সুরু করবার অনেক আগে থেকেই আমিষ আহার একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। শুধু কি তাই তিনি অত্যন্ত অল্পাহারী। দিনের বেলা শুধু আতপ চালের অন্ন ইষ্টদেবকে

নিয়মিতভাবে নিবেদন করে, সেই প্রসাদ ভোজন করেন সঙ্গে দুধ ঘি যথেষ্টই থাকে। যে বাড়ীতে তিনি কথকতা করেন তারা তো খুব ধনীলোক। এবেলা ওবেলা ক'রে কথার আগে পরে প্রায় চার সের দুধ তাঁর পেটে যায়। আর মাঝে মাঝে দুধের সর, একটু ফল সন্দেশ এগুলো তো আছেই। রাত্রে কথকঠাকুর লুচি আর দুধ খেয়েই কাটিয়ে দেন। তিনি বলেন, রাত্রে পেট ভরে খেলে ভাল ঘুম হয় না, আর কণ্ঠও ভাল থাকে না। তবে লুচি একসের মিহি ময়দার হয়, সেই থেকে দু'চারখানা যা থাকে সঙ্গী ভক্তেরাও একটু আধটু প্রসাদ পায়। খুব তাড়াতাড়ি ঠাকুর ঘুমিয়ে পড়েন, আর শয্যাত্যাগ করেন সকলের আগে। কখন যে তিনি প্রাতঃকৃত্য সেরে জপ কর্ত্তে বসে যান, তা কিন্তু আমরা একদিনও টের পাই নি। সত্যিই ঠাকুরের কি শীত কি গ্রীষ্ম সব সময়ে নিয়মিতভাবে ভোরের বেলা শয্যাত্যাগের অভ্যাস—এ কিন্তু আমাদের কাছে খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় বলে মনে হ'তো। লক্ষ্য করেছি, যখন তিনি শয্যায় শুয়ে পড়েছেন, অমনি তাঁর নাক ডাকা শুরু হয়েছে। গভীর ঘুম সুনিদ্রার আনন্দের তিনি অধিকারী। তাই বুঝি তাঁর শরীরে এমন সুন্দর স্বাস্থ্য, মুখে অমন কান্তি, আর কণ্ঠেও সুমধুর সংগীত। ঠাকুর তোমার অভ্যাসের জয়!

সূর্য উদয়ের সঙ্গে ধূপধুনোর গন্ধে আঙ্গিনা আমোদিত হ'য়ে উঠ্‌ল। গ্রামের সব বৃদ্ধেরা একে একে এসে আসনে বসে পড়লেন। মায়েরা এলেন। ছেলের দল ছুটাছুটি করে এসে জুটল বিস্তীর্ণ সামিয়ানার তলায়। তাদের দুরন্তপনায় কেহ কেহ বিরক্ত হয়ে তাদের তাড়া কর্লেন সেখান হতে। তারা ছুটে গেল মাঠের

দিকে। এলেন বাড়ীর বড় গিন্নী। বর্ষীয়সী প্রসন্নবদনা ক্ষৌমবাস-পরিধানা। মাথায় এখনও ঘোমটা আছে টানা। যদিও লজ্জা করবার মত কোনো ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত নেই, তবু এই অহৈতুক লজ্জার পরিচায়ক ঘোমটা টানা যেন সেই প্রাচীনার জীবনের উপরও ব্রতধারিণীর এক সজীবতার প্রলেপ দিয়ে দিয়েছে। তার হাতে রয়েছে একটি পুষ্পপাত্র—নানা বর্ণের ফুল, তাতে একপাশে একটি ছোট রূপোর বাটিতে চন্দন আর দূর্বা, তুলসী প্রভৃতি পূজার দ্রব্য। তাঁর সঙ্গিনীর হাতে আছে ভোগের জন্য বাতাসা মিষ্টি, ফল আর গেলাসে ভরা জল। পাত্রগুলি যথাস্থানে রাখা হল। বেদীর ডানদিকে প্রদীপটিকে উস্কে দেওয়া হল, ধুনুচিতে খানিকটা ধুনো দেওয়া হল। মায়েরা নিজের নিজের আসনে বসে পড়লেন শান্তভাবে।

নানারঙ্গের কাপড়ের তৈরী চন্দ্রাতপতলে কথকতার বেদী। এই চন্দ্রাতপটি প্রতি বছরেই এ সময়ে টাঙ্গানো হয়। অনেক দিনের পুরানো হলেও রং তেমন ঝল্‌সে যায় নি। শোনা যায়, বড়গিন্নীর শাশুড়ীর বাপের বাড়ী থেকে এই চন্দ্রাতপ এসেছিল। সে অনেক দিনের কথা, সত্যি মিথ্যে হলফ্ করে বল্‌বার উপায় নেই। গিন্নী বলেন, আমি এ বাড়ীতে আসা পর্যন্ত দেখে আস্‌ছি এই চাঁদোয়ার তলায় বসে কথকঠাকুর কথকতা কর্তেন। আমার শাশুড়ী যখন প্রথমবারে পুরাণ দেন তখন আমার বিয়ে হয়নি। শুনেছি এই চাঁদোয়া তখনও ছিল। চাঁদোয়ার তলায় তক্তপোষের উপর গালিচা। গালিচাখানা কাশ্মীরী কিন্তু শত বর্ষেরও অধিক তার বয়স। স্থানে স্থানে একটু ছিন্ন হয়েছে। গেলবারে কুম্ভমেলায়

গিয়েছিলেন বড় বউমা। তিনি কথকঠাকুরের বসবার জন্য আগ্রা থেকে সুন্দর ঝালর দেওয়া একখানা রেশমের আসন এনেছেন। সেই আসনখানা গালিচার উপর দেওয়া আছে। পাশেই একটি তাকিয়া। তুলো দেখা যায়, নতুন ওয়াড় দেওয়া হয়েছে। বেশ পরিষ্কার দেখ্‌তে হয়েছে। সম্মুখে পুরাণ রাখবার জন্য একখানা ছোট জলচৌকী তার উপর লাল শালুর কাপড় চাপা দেওয়া হয়েছে। ডানদিকে কোশাকুশী আর সব কুচো জিনিষপত্র রয়েছে। একখানা রেকাবের উপর একখানা নতুন গামছাও আছে। ঠাকুর সময় সময় কথার অবসরে চোখমুখ মার্জনা করেন এই গামছা দিয়ে। একটি ছোট পাত্রে আদা কুচানো, লবঙ্গ প্রভৃতিও রয়েছে। গান করতে কখনও যদি একটু লবঙ্গ গালে দিতে হয়, দিতে পারেন। আমরা কিন্তু আমাদেব কথকঠাকুরকে কখনো কথকতার সময় বা গানের সময় আদা লবঙ্গ গালে দিতে দেখিনি। তিনি বলেন, এটা একটা বদ্ অভ্যাস আর নিজের সাধনার উপর অবিশ্বাস। গান গাইতে হলে আদাকুচো লবঙ্গ চাই এ আবার কেমন কথা ?

ঐ শোন কীর্তনের আওয়াজ। ছেলের দল ছুট্‌ল নেচে নেচে কীর্তন দলের উদ্দেশ্যে গ্রামের বাঁকা পথে। ভিন্ন গ্রাম থেকে এই দলটি প্রতিদিন নগর-কীর্তন করে এই বাড়ীতে আসে যে কদিন কথকতা হচ্ছে এখানে। লোকগুলি খুব ভক্ত তাই অত সকাল-বেলা স্নান ফোঁটা করে কীর্তন নিয়ে আসে। ঠাকুর তাদের একদিন বলে দিয়েছেন—তোমরা না এলে আমার পুরাণ শুরু হবে না। ঠিক সময়ে আসবে। সেই থেকে তারা নিয়মিতভাবে আসছে।

"নেচে নেচে যায় রে গোরা, নিতাই প্রেমে হয়ে ভোরা"

যেমন তাদের গানের পদে সরলতা তেমন তাদের মুক্তকণ্ঠের উদাত্ত স্বর। সমগ্র গ্রামখানি তাদের এই কীর্তনের ধ্বনির সঙ্গে নেচে উঠে প্রতিদিন সকালবেলা। কেউ পুরাণ শুনতে আসুক আর নাই আসুক সংকীর্তনের ধ্বনি তাদের সকলের মধ্যে পুরাণারম্ভের ছবিটিকে সজীব করে দেয়, ধ্বনির তরঙ্গে। শাঁখ, কাঁসর, ঘণ্টা, বেজে উঠল একসঙ্গে। সে কি তুমুল শব্দ। কীর্তনের দল আসরে প্রবেশ করেছে। এবারে পুরাণ পূজা হবে।

"এস দুটি ভাই গৌউর নিতাই
দ্বিজমণি দ্বিজরাজ হে......

মূল গায়ক গান ধরিলেন উচ্চকণ্ঠে—

আমি পূজিব চরণ এই আকিঞ্চন
রাখিব হৃদয় মাঝে। আস্‌তে হবে হে ;

পদের সঙ্গে আঁখর জুটিল—একা যদি আসতে নার, ভাই নিতাইকে সঙ্গে কর—আমার হৃদয়ে নদীয়া কর—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে কি উল্লাস, সে কি ধ্বনি, মনে হয়, যেন গৌর নিতাই নেচে নেচে এসে তখনই উদয় হলেন। মৃদঙ্গ বাদক বার দু'এক করতাল বাদককে ধমক দিয়ে ঠিক তালে বাজাবার ইঙ্গিত করছিলেন, তাতে রসভঙ্গের উপক্রম হলেও শেষ পর্যন্ত আর হয় নি। কীর্তন সমাপ্ত হল।

কথকঠাকুরের পা ধুইয়ে দেওয়া হল। গিন্নীমা গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। ঠাকুর ধীরপদবিক্ষেপে বেদীর

সম্মুখে প্রণত হয়ে আসনে উঠে বস্‌লেন। আসনের সম্মুখে প্রণাম করার মানে সকলে বুঝে উঠ্‌তে পারে নি, তাই তারা ফিস্ ফিস্ করে উঠ্‌ল। প্রশ্ন, ঠাকুরমশায় আবার কাকে প্রণাম করছেন। তিনিই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ।

ঠাকুর জানেন, এই আসন আমার নয়। এই আসন ব্যাসদেবের। ব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ ব্যাখ্যা করেছেন যে ভাবে, আজ তারই মত লোকের কাছে ব্যাখ্যা করতে বসেছি। এ ব্যাখ্যার আসনে আমার গুরুগণ যুগযুগান্তর ধরে বসেছেন। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজ আমি পুরাণ কথা বর্ণনায় প্রবৃত্ত। সর্বপ্রথম এই আসন আমার পূজার সামগ্রী। আসন স্পর্শ করে তিনি কি যেন মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। পণ্ডিতেরা বলেন আসন শুদ্ধ করে আসনে বসতে হয়। কথকঠাকুরের ডানদিকে পৃথক্ আসনে পুঁথি নিয়ে বসলেন ধারক ঠাকুর। ইনি অত্যন্ত স্বল্পভাষী। প্রথম তো মনে করেছিলাম, বুঝি ইনি কথাই বলেন না। সেদিন দেখলুম্ তিনি অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথকঠাকুরের সঙ্গে কি এক শ্লোকের পাঠক্রম নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রশ্নোত্তর করে মীমাংসা করে দিলেন, তখন আমাদের সন্দেহ গেল দূর হয়ে। সকলেই সেদিন বুঝেছিল যে অল্পভাষী সেই রোগা লোকটির পেটে কত বিদ্যা।

বাংলার বাইরে কথকঠাকুরকে প্রায়শঃ ব্যাসজী ব'লে সম্মান করে। রামায়ণ কথককে রামায়ণীজীও বলে। সাধারণতঃ পুরাণ পাঠের সময় পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বরণ করবার রীতি ছিল। বস্ত্র মূল্য বেশী হওয়ার ফলেই হউক বা শ্রদ্ধাঅল্পতার ফলেই হউক. এখন সেভাবে পাঁচ সাতজন লোককে ব্রতী করার উৎসাহ আর

দেখতে পাওয়া যায় না। একজন ব্রাহ্মণ প্রায়শঃ বাড়ীর পুরোহিত বা গুরুকে শ্রোতারূপে বরণ করে তাঁর আনুগত্যেই গৃহস্থের পুরাণ কথা শ্রবণের রীতি চলে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। কথকঠাকুর আসরে আসার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে নমস্কার অভিবাদন করেন—শিষ্টগণের মধ্যে এই প্রচলিত রীতি। কালের প্রভাবে সে সব লোপ পাবার উপক্রম হয়েছে।

পুরাণপাঠক, শ্রোতা, ধারক এরা সব সকালবেলা পুরাণের অংশ বিশেষ মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি কবেন—তার নাম পারায়ণ। ব্যাস, বৈশম্পায়ন, শুক, বশিষ্ঠ, যেমন প্রাচীনকালে যজ্ঞের শেষে পুরাণ কথা বল্‌তেন শুনতেন—লোমহর্ষণ সূত উগ্রশ্রবা সূত, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুরাণপাঠকের আদর্শ অনুসরণ করে সেইভাবে পবিত্র পরিবেশের মধ্যে তাদের মুখের সমুচ্চারিত সেই সহজ সরল মাধুরী-মাখা সংস্কৃত ছন্দে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম যুগের কাহিনীর বর্ণনা সে যে কি গাম্ভীর্য ও তাৎপর্যপরিপূর্ণ তা আর কজন হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে পারে? তবু আজও শত শত নরনারী মধুর কণ্ঠের আকর্ষণে পাঠকের দিকে অপলকনেত্রে অবোধ্য সেই বাণী শ্রবণ করে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে। তাদের বিশ্বাস ঐ মন্ত্রকথা শ্রবণেই অশেষ মঙ্গল। স্তব্ধ হৃদয়ে তাদের এই মহদুপাসনা ব্যর্থ হয়নি জীবনের পথে। শাস্ত্রশ্রবণ, পুরাণকথা, কথকতা আর কীর্ত্তনের সুর অতি সাধারণ গৃহস্থকে করেছে নীতিবান্‌, সত্যনিষ্ঠ, বিবেচক ও পরোপকারী। এই ধর্মানুষ্ঠানের শৃঙ্খলায় গ্রাম গ্রামান্তরের জনগণের প্রেমের বন্ধন সামাজিকতার সম্বন্ধ হয়েছে দৃঢ়তর। অখণ্ড আত্মীয়তাবোধ জাগ্রত করেছে সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে। সাধুকথায়, গানে, ব্যবহারে যে

বান্ধবতার সৃষ্টি হয়েছে স্বার্থানুসন্ধান তাকে বাধা দিতে সমর্থ হয়নি কোনো কালে। ঘণ্টা শাঁখ বেজে উঠল। পাঠকের পাঠ শুরু হয়েছে।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

আমায় তাড়াতাড়ি করে গ্রামান্তরে যেতে হবে তাই সেদিন আর আমার ভাগ্যে কথকতা শোনা হলো না, লোভ হল একদিন শুনতেই হবে।

(২)

ঘোষেদের বাড়ী। আঙ্গিনায় সতরঞ্চি পাতা। দলে দলে লোক ছুটেছে আগে থেকেই গাঁয়ের উচু নীচু পথ বেয়ে। দূর-গ্রামের লোক যাদের আত্মীয়বাড়ী এ সাতঘরা গ্রামে আছে, তারা একটু আগেই এসে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আসর জমিয়ে বসেছেন। কত দিনের কত পুরানো কথকের কথা উঠেছে। সকলেই উৎসুক হয়ে কথকঠাকুরের পথ চেয়ে অপেক্ষা করছেন। তিনি এ গ্রামে এই প্রথম কথকতা করতে এলেন। কাজেই স্ত্রী পুরুষ সকলেরই একটা বিশেষ আগ্রহ তাকে দেখবার।

ঐ আসছেন তিনি। বাঃ ভারী সুন্দর চেহারাতো, সত্যই দেখে ভক্তি হয়। দোহারা গড়ন দীর্ঘাকৃতি, দ্রুতপদ বিক্ষেপে আসছেন এই দিকেই। কুঞ্চিত কেশ স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত, গৌরকান্তি, অঙ্গে আবার হল্‌দে গরদের চাদর। খালি গায়ে চাদরখানা ফুরফুরে হাওয়ায় উড়ে উড়ে বারবার পড়ে যায়—সরে যায়—শরীর থেকে। গায়ের রংএ আর চাদরের রংএ যেন খেলা

হচ্ছে—এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায়। মুখখানা যেন অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিতে ভরপূর। চোখছুটি করুণামাখা। যে দিকে তাকায় মনে হয়, যেন কোন দরদীকে খুঁজে বেড়ায়। এ চোখের দৃষ্টি কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না বুঝি। অপর লোকের কথাতো দূরে থাক, আমার মত একজন অবিশ্বাসীরও ঐ লোঁকটিকে দেখে মনের মধ্যে কেমন একটা ভাবভক্তির যেন আঘাত অনুভব হলো। মনে হলো, সত্যই বুঝি এসব মানুষ ভগবানের কোনো শক্তি পেয়েছে, তা না হলে এমন রূপ আর এমন দৃষ্টি হয় কেমন করে? দেখলুম, তার পশ্চাদনুসরণ করেছেন এক প্রৌঢ় ভক্ত আর ছুচারটি ছোট ছেলে মেয়ে। আমার ঠিক সামনাদিয়েই এরা চলে গেলেন, ঠিক ঘোষেদের বাড়ীর দ্বারে। আমি যেন তখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম, শুধু চুপ্ করে কি দেখছিলুম।

কথকঠাকুরের মণ্ডপ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই কাঁসর ঘণ্টা শাঁখ বেজে উঠলো সব একসঙ্গে। এখন আমি ধীরে ধীরে ঐ দিকে অগ্রসর হয়েছি। যথারীতি গ্রন্থের পূজা করে ঠাকুর চোখ বুজে অর্দ্ধস্ফুটকণ্ঠে স্তবপাঠ করছেন।

কস্তুরী তিলকং ললাট ফলকে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভম্।
নাসাগ্রে গজমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণম্॥

কথাগুলি এমন গভীর প্রেমমাখা মনে হলো যেন তিনি ভগবানের ঐ শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি সাক্ষাৎ দর্শনের আনন্দে ডুবে গেছেন। তিনি ধীরে ধীরে একবার সভার দিকে চেয়ে মাথা নোয়ালেন। তার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মত সমগ্র শ্রোতৃ মণ্ডলী

অবনত শির। কি তাঁর ব্যক্তিত্ব! ভক্তির প্রভাবে তখন সভায় প্রত্যেকটি হৃদয় উন্নত ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ধন্য লোকশিক্ষক ঠাকুর, তোমাকে নমস্কার। আমি তার উদ্দেশ্যে নমস্কার করলুম।

তিনি সুর করে কীর্ত্তনের ভঙ্গিতে গাইতে লাগলেন—

শুক মুখের গীত শুনে প্রাণ জুড়াও,
কেন কুজন কোকিলের মুখে কুরব শুনতে ধাও॥
নিগম কল্পতরুর গলিত অমৃত ফল
ভাগবত রসময়—জীবনে সঞ্চারে বল
পরীক্ষিতের রক্ষৌষধি পিবরে মন নিরবধি
কেনরে হরিবিমুখ ভিন্ন পথে যাও।
শোনরে অবোধ জীব নাম গায় সদাশিব
ব্যাস নারদ আরাধিত হরি নাম গাও॥
যে নামে ধ্রুব প্রহ্লাদ পায় পরম প্রসাদ
সেই পদে মন সমর্পিয়ে জন্ম সফল করে লও॥

গানের কথায় উচ্চস্তরের কোনো কাব্যরস ছিল না। কিন্তু ঠাকুরের কণ্ঠের রসে সেই অতি সাধারণ কথাগুলি যেন প্রাণের একটি বিশেষ বিলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ধৈর্য্য ধরে শুনবার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি হলো। শুরু হল কথা—! সে খুব প্রাচীন কালের সংবাদ।

এই কলিযুগ তখন আরম্ভ হয়নি। মুনি ঋষি সাধু সমাজে বিচার চলেছে। সত্যযুগ চলে গেছে। সে যুগের ধ্যান, ধারণা, সমাধির যোগ্যতা আর মানুষের নেই। মানুষের সত্য সরলতার

অভাব। মন চঞ্চল, চঞ্চল মনে ধ্যান সম্ভব নয়, তপস্যা না করলে মন স্থির করার আশা বাতুলতা। শরীব, মন, বাক্য-সংযম ভিন্ন তপস্যা কেমন করেই বা হবে? লালসার আগুন নিবৃত্ত না হলে কি আর তপস্যা করা সম্ভব? ত্রেতাযুগও তার প্রভাব হারিয়েছে। যাগ, যজ্ঞ আর কে কর্ব্বে বল? না পাওয়া যায় তেমন তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ, না কিছু। বেদমন্ত্র ঠিক ঠিক উচ্চারণ না হলে বিপরীত ফল হয়, সে কি আব কারুর জানা নেই?

'ইন্দ্রশক্রুর্বর্দ্ধস্ব' বলতে স্বরের একটু ব্যতিক্রম হল। শত্রুব ক্ষতি না হয়ে নিজেরই ক্ষতি হল। তাইতো যজ্ঞ করার অনেক-খানি দায়িত্ব। এ বিপদ মাথাব উপর রেখে কে আর যজ্ঞ করতে যাবে? ভাল ঘৃত পাওয়া যায় না। তেমন যজ্ঞীয় দেশ, কাল, উপযুক্ত যজমান কোনোটার যোগাযোগ হয় না। কাজেই সর্ব্ব কর্ম্ম এক রকম বন্ধই হয়ে গেছে। তারপর দ্বাপরের পূজা অর্চ্চনা চলেছে বটে, কিন্তু হলে হবে কি? মুনিরা ভাবছেন, এই দ্বাপরের শেষ যে দুরন্ত কলিকাল আসছে, তখন কি হবে? মানুষ তো সকল ধর্ম্ম-কর্ম্ম ভুলে পেটের দায়ে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে যে কোন উপায়ে শুধু অন্নবস্ত্রের সংগ্রহেই দুর্লভ মানবজনম অতিবাহিত কর্ব্বে তখন মানুষের উদ্ধারেব কি উপায় হবে? আর আমাদের যদি সে সময় থাকতেই হয় এই পৃথিবীতে, তখন আমরাই বা এই কলির প্রভাব থেকে কিভাবে মুক্ত থাক্‌বো, সেটিও চিন্তাকরা প্রয়োজন।

কি ভাবে এ ভবে দিন যাবে তবে, কোথা আছ ওহে দীন বন্ধু হরি॥

নাহি জপতপ ধ্যানের প্রচার, চঞ্চল এ মন কি করিব সদাচার।
সত্যযুগে সত্যনারায়ণ সার, নাই সেই জ্ঞান হারায়ে
সারাৎ সার ॥
এখন কিসে হব পার, এই অসার সংসার, দিশা হারা
মোরা বলহে কি করি।
কোথা আছ ওহে দীনবন্ধু হরি ॥

গানের সঙ্গে শ্রোতৃবৃন্দ গদ্ গদ কণ্ঠে বলে উঠে 'হরি বোল হরি বোল'। এর মধ্যেই দেখলুম, কোনো কোনো ভক্তের চক্ষে জল গড়াবার উপক্রম হয়েছে। এদের বড় তাড়াতাড়ি ভাব হয়ে যায়। এসব লোক কথকঠাকুরের বড় প্রিয়। তিনি গুটি কয়েক এরকম ভক্ত খুব কাছে নিয়ে বসেন।

তিনি বলেন, এরাই তার যথার্থ সমজদার শ্রোতা। এদের মুখ না দেখে তিনি কথাই বলতে পারেন না। থাক্ সে কথা, ভাবে বুঝলুম, সেদিন ঋষি-প্রশ্ন প্রসঙ্গেই কথকতা। শুধু কথা নয়, কথকতা ; এর মধ্যে কথাগুলি এমন সুন্দর ভাবে সাজানো আর মাঝে মাঝে অঙ্গ ভঙ্গী সহযোগে গান যে, তাতে সাধারণ লোকের ভারী আনন্দ হয়। কথা চলেছে—

নৈমিষেঽনিমিষ ক্ষেত্রে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
সত্রং সর্গায় লোকায় সহস্রসমমাসত ॥

কুলপতি শৌনক ষষ্টি সহস্র মুনির সঙ্গে পরমানন্দে হরিকথারঙ্গে পরম রুচির সাধুগণ পরিসেবিত কল কোকিল কাকলি কুজিত সজ্জনগণ মনোভিরমিত লীলামধু স্বাদন লোলুপ মুনি মানস ভৃঙ্গ-

গুঞ্জিত তপস্যা ফল পরিপূজিত বিবিধ বিচিত্র বনস্পতি সুবিরাজিত সাধনা ধন্য পুণ্যময় সর্ব্বারণ্য ধন্যাতি ধন্য নৈমিষারণ্যে আজ কি বিপুল আনন্দ তরঙ্গ! বুঝিবা দেবতাগণ সেই মহা মহোৎসবে সমাগত। আর তা না হবেই বা কেন? যেখানে হরিকথা, সেখানে যে সকল দেবতা সকল তীর্থের সমাগম হয়। শুধু কি তাই, আরে ভাই, ভগবান সপার্ষদ সেই স্থানে শুভাগমন করেন।

তুলসী কাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ।
পুরাণপঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥

আরো দেখ,

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ বেণী গোদাববী সিন্ধু সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদার কথা-প্রসঙ্গঃ

তাই নৈমিষারণ্য আজ সর্ব্বতীর্থ বরেণ্য। দেখলুম, কথক ঠাকুর নবীন হলেও তার পুঁথিখানা নূতন নয়। অনেক দিনের হাতে লেখা পুঁথি। জীর্ণ একখানা নামাবলিতে বাঁধা তার উপর লাল সালুর আবরণ। এ বাড়ীতে কথকতা শুরু হবে বলে একগজ ছিটের কাপড় দেওয়া হয়েছে, সালুর কাপড়ের উপর সেই ছিটের টুকরা জড়ানো ছিল। পাঠের আরম্ভে এগুলি একে একে খোলা হয়েছে। তাই পরিষ্কার দেখলুম, পুঁথির মলাট কাষ্ঠ-ফলকের উপর সেকেলে চিত্রশিল্পীর অঙ্কিত বিচিত্ররঙ্গে সমুদ্রমন্থনের চিত্রটির শোভা আছে। একদিকে বিকট দর্শন দানবের দল মন্দর-পর্ব্বতে বেষ্টিত বাসুকিনাগের ফণার দিক ধরে টানাটানি করে বিষের জ্বালায় জ্বলছে। অপর দিকে খুব খুশী মনে দেবতার দল নাগের পুচ্ছের

দিক্‌টা ধরে আছে। মন্দর পর্ব্বতের তলায় সমুদ্রের স্বচ্ছ ক্ষীর নীরের মধ্যে বিরাট কূর্ম্মাকৃতি ভগবানের রূপ দেখা যাচ্ছে। পর্ব্বতের এক পাশে শূন্য পথে গরুড়াসনে ভগবান নারায়ণ প্রসন্নবদনে যেন দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন দর্শন করছেন। অনেক দিন ধরে পূজার চন্দনের দাগ লেগে মাঝে মাঝে রংটা একটু মলিন হয়েছে। তা হলেও মনে হয় যেন, দুদিন আগে এই ছবি আঁকা হয়েছে এমন তার চাকচিক্য। তুলট কাগজে মুক্তার পংক্তি লেখা কি সুন্দর। ভাগবতের সবখানি এই পুঁথির মধ্যে ললিতাক্ষরে লেখা আছে। ধারে ধারে তিন পুরুষের হাতের লেখার নিদর্শন ক্ষুদ্র টিপ্পনী। কোথাও শ্লোকের একপাদ কোথাও পূর্ণশ্লোক আর কোথাও কোনো দৃষ্টান্তের সঙ্কেত। যারা ঐ পুঁথি নিয়ে কথকতা করেছেন, তাদের রুচি ও শিক্ষা অনুসারে নানা শাস্ত্রের প্রমাণ পাশে পাশে সংগৃহীত।

গুরুদেব বলেছেন, পুরাণ যেমন ষট্‌-সংবাদ না হলে রুচিজনক হয় না, তেমন পুথিও তিন পুরুষের না হলে শোধন হয় না। এসব পুঁথিও তিন চার হাত বদল হয়ে অনেক তথ্য পূর্ণ হয়, আর লিপিকর প্রমাদও সংশোধিত হয়ে যায়। আমি মনে করেছিলুম, ভাগবতের মূল শ্লোক আর তার কোন প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা বোধহয় পুঁথিখানায় আছে। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম, তা নয়। মাঝে মাঝে কোথাও ভাগবতের মূল শ্লোক আছে, আর প্রায়শঃ নানা শাস্ত্রের প্রমাণ উপাখ্যান আর তার সঙ্গে দৃষ্টান্তগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। দেখলুম, কয়েকখানা পাতায় সমাস বহুল সুদীর্ঘ বাক্যাবলীর সমষ্টি আছে। সেগুলি মূল পুথির অংশ নয়, কিন্তু খোলা পাতা হিসাবে ঐ সঙ্গেই আছে। ঠাকুর বলেন, ঐগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এই পাতাগুলির মধ্যে কোনটা বনের বর্ণনা, কোনটা পর্ব্বতের বর্ণনা আর কোনটা রাজ-সভা বা নগরের বর্ণনা। এই বর্ণনাগুলি কথা জমানোর জন্য খুব প্রয়োগ হয়ে থাকে। এক নিঃশ্বাসে এমন সুন্দর বর্ণনা করার মত পাণ্ডিত্য চিরকাল প্রশংসনীয়। যেমন শব্দঝঙ্কার তেমনি যমক অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি সন্ধিসমাসের প্রবলবন্যা আর স্বভাব বর্ণনার সরস-রীতি। সত্যই এই সকল কাব্য অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। আমার ধারণা ছিল, গ্রাম্য যাজক পুরাণ-পাঠক তাহার আর বিদ্যা কতদূর। সাধারণ লোকের কাছে কোন মতে অর্থসংগ্রহ করে জীবিকা অর্জ্জনই এদের বৃত্তি। ভালভাবে আর বিদ্যাভ্যাস করবেন কখন। কিন্তু আমি ঠাকুরের কথকতা শুনছিলাম, আর আমার ভুল ধারণা কেটে যাচ্ছিল। সত্যই আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম কথার সরস বাচন ভঙ্গীতে। ঠাকুর একটি বার করে কথা বলেন, আর এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করেন—সহাস্য বদনে। মনে হয়, যেন তিনি সমর্থন পাওয়ার জন্যই এইভাবে তাকিয়ে দেখেন। দেখলাম তার মুখে কোন বিকৃত ভাব নেই, শির কম্প নেই। কণ্ঠের স্বর মধুর তীব্র, তাতে একটুও আটকায়না। কি পরিষ্কার ভাবে তিনি অনর্গল ভাগবতীয় প্রসঙ্গ বলে যাচ্ছেন। আর মাঝে মাঝে গান গেয়ে সকলকে যেন আনন্দে অভিষিক্ত করছেন। এসব দেখে আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি। সহরে কত বড় বড় বক্তার বক্তৃতা শুনি, কিন্তু কখনো এমন প্রাণ গলানো কথাতো শুনিনি, গানতো হরদম রেডিও গ্রামোফোনে চলেইছে, কিন্তু এমন মন কাঁদানো গানতো কারুর কাছে শুনিনি। কথক ঠাকুর যেন ভোজের বাজী জানেন। একদিনের মধ্যে সমস্ত গ্রামে তার একটা অদ্ভুত

প্রভাব পড়েছে। সকলেই ঠাকুরের দর্শন, তাঁর সঙ্গে আলাপ আর তাঁর বাড়ীর পরিচয় পাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে। তিনি একদিন গান গেয়ে ছিলেন। বল মাধাই মধুর স্বরে, হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে।
হরি নামের নৌকা ঘাটে বাধা, ডাকলে নিতাই পার করে॥

সেই দিন হতে সবারই মুখে শুনতে পাই "ডাকলে নিতাই পার করে" এই কথা কটির যে কি আকর্ষণ তা আর কি বলবো। এ যেন সত্যই কোন করুণ কাণ্ডারীর আকুল আহ্বান। আজও থেকে থেকে কানে বেজে ওঠে জীবন সন্ধ্যার অন্ধকারে। একটি ছাত্রের এগজ্যামিনের পড়া তাকে একটু দেখিয়ে দিতে হবে বলে সেদিন কথকতা শেষ পর্য্যন্ত শোনবার সুযোগ হয়নি।

(৩)

আজ রবিবার শুনলুম আজ খুব ভাল গান হবে। বামন ভিক্ষা। সকাল থেকেই গিন্নী মায়েরা যেন কাজকর্ম্ম গুছিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আমারও ছুটি, আজ শুনতেই হবে। এই কদিন ক্রমাগত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছিল। সন্ধ্যার আগেই সভায় বহুলোক এসে অপেক্ষা করছেন। কথকতা শুনতে এই সারকেলের 'এস ডি ও' নাকি আসবেন! তিনি একজন খুব ধার্ম্মিক লোক। এদিকটায় তার প্রশংসা করে অনেকেই।

তিনি আসবেন বলে গ্রামের যারা প্রধান মাতব্বর তারাও আসছেন তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ সপার্ষদে। কাজেই সভাটি এইদিনে একটু ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। শুধু ছেড়া মাদুর আর সতরঞ্চি নয়। একদিকে একখানা বড় গালিচা দেওয়া হয়েছে। বিশিষ্ট

ব্যক্তিরা সেই আসনে বসবেন বলে। সম্মুখে তো ব্রাহ্মণদের জন্য পৃথক আসন আছেই। মেয়েদের আজ বড়ই অসুবিধা হচ্ছে একে তো আজ কুলের কুলবধূ পর্য্যন্ত এসেছে "বামন ভিক্ষা" দেবার জন্যে। তার উপব তারা প্রত্যেকে যে সব থালা আর ডালায় সিঁধে সাজিয়ে এনেছেন, তাতে অনেকটা স্থান জুড়ে আছে আগে থেকেই। মায়েদের শ্রদ্ধা আর দানের প্রবৃত্তি পুষ্ট করেছে এই সকল কথকঠাকুরদের। তারাই অন্নদান করে ঠাকুরের অন্নাভাব দূব করেন, বস্ত্র দানের ফলে কখনো তাঁকে বস্ত্র ব্যবসায়ীব দ্বারস্থ হতে হয়না; স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার সে গুলো ব্রাহ্মণীর ভাগ্যে তুচার খানা মন্দ হয়নি। ব্রাহ্মণ কখন বামনভিক্ষায় সোনার পৈতা, রুক্মিণী বিবাহে সোনার শাঁখা, তুলসীর বিবাহে কানফুল, ভরত মিলনে রূপোর পাতুকা, এরকম সময় সময় অনেক কিছুই পেয়েছেন। থালা ঘটী বাটী আর ছত্র দণ্ডের তো কোন কথাই নেই। এখনো এক গাদা লাঠী আর ছাতা কথক ঠাকুরের ঘরে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সভায় খুব গোলমাল শুরু হয়েছে। স্থূলকায়া বড়ালগিন্নী বসবার স্থান পাচ্ছেন না, এই নিয়ে মেয়ে মহলে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ঠাকুর অবস্থা বুঝে গান ধরলেন আব অমনি সব চুপচাপ। সভা শান্ত হয়ে গেল। গানটি বেশ এখনো আমার মনে পড়ে—

সত্যযুগে তুমি সত্য নারায়ণ।
পতিব্রতা সতী তুলসীর কারণ॥
ব্রতভঙ্গ করি অভিশাপ করিলে বরণ,
ওহে বিপদবারণ কি কারণে কর কিবা আচরণ
বুঝিতে না পারে ব্যাস পঞ্চানন।

বলি দৈত্যরাজ বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করে,
যজ্ঞ স্থলে আগমন বামন রূপ ধরে।
দেবতার হিতে একি কাজ করিলে?
ত্রিপাদ ভূমি ছলে সর্ব্বস্ব হরিলে।
ওহে নারায়ণ, তোমার মহিমা অপার।
কি বলিব আর আমি দীন ছাড়॥
দান লয়ে বলির দ্বারী হলে দ্বারে।
ছলনাময়হরি নাম রটিল সংসারে॥

ভাঙ্গা কীর্ত্তনের ঢংএ গান, তার নাই তাল, নাই লয়—কিন্তু কণ্ঠের মাধুর্য্যে বিশ্ব জয়। কথকঠাকুরের 'জয় জয় কার'। লোকে বলে, এমন গান আর কোন্ কথকের মুখে কে শুনেছে? অতি সুন্দর অতি সুন্দর, আমি ত অবাক হয়ে বসে শুনি, আর ভাবি, এমন একটা কি নতুন কথা শুনলুম? তবু সভা থেকে শুরুতেই উঠে যাওয়া একটা অন্যায় কাজ হবে, অপরের রসভঙ্গ হবে, ভেবে ধৈর্য্য ধরে বসে রইলুম। ঠাকুর সুরে সুরে বলেন—

বলিকে ছলিতে হরি বামনের রূপ ধরি
যজ্ঞস্থলে হইলা উপনীত।
পদতলে চঞ্চল ধরণী যে টলমল
চরণের পরশে বিচলিত॥
যজ্ঞস্থলে ঋত্বিক পুরোহিত মান্ত্রিক
সর্ব্বজনে দেখে আচম্বিতে।
জ্যোতির্ময় বটুরূপ অতি অভিনব রূপ
যজ্ঞমূর্ত্তি দেখি ভাবে চিতে॥

মন্ত্র উচ্চারিতে ভুল   যজ্ঞ বিঘ্নসমাকুল
দেখি বুঝি বিষ্ণু যজ্ঞেশ্বর।
আসিয়া উদয় হৈলা   সর্ব্ববিঘ্ন দূরে গেলা
সর্ব্ব ত্যজি ভজ বিশ্বম্ভর॥

সেই সুন্দর বামনমূর্ত্তি দর্শনে যজমান পুরোহিত সকলেই সচকিত। এরূপ রূপ আর কখনো কেহ দেখেনি। উজ্জ্বল মুখশ্রী, বক্ষে যজ্ঞোপবীত, স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি, হস্তে ছত্র, দণ্ড ও কমণ্ডলু। পদে কাষ্ঠপাদুকা। মনে হয়, মূর্ত্তিমান ব্রহ্মচর্য্য। আর না হইবে কেন? যিনি ব্রহ্মণ্যদেব তিনিই যে ব্রহ্মচারীবেশে আসিয়াছেন। ঐ দেখ তাঁর পদভারে ধরণী চঞ্চল হয়েছে, তাঁর দৃষ্টিতে সূর্য্য ম্লান হয়েছে, অঙ্গগন্ধে পদ্মবন আমোদিত হয়েছে। ভ্রমরগুলি পাদপদ্ম মধুপানে প্রমত্ত হয়ে ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়ে পড়ছে। ধন্য বলিরাজ তুমি, ধন্য তোমার বিশ্বজিৎ যজ্ঞ। আজ এই অবসরে বিশ্বেশ্বরের শ্রীচরণ ধৌত করে লও। বলি বলেন—

স্বাগতং তে নমস্তুভ্যং ব্রহ্মন্ কিং করবাম তে।
ব্রহ্মর্ষীণাং তপঃসাক্ষান্মন্যে ত্বার্য বপুর্ধরম্॥

হে ব্রহ্মন্, আপনার শুভাগমনে আমরা ধন্য হয়েছি। আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাই। আপনার চরণে প্রণত আমি। ব্রহ্মর্ষি সাধুগণের তপস্যার ফল স্বরূপ আপনার কোন্ সেবায় সন্তোষ দান করতে পারি? আজ আমার মনে হয়, পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে যত শ্রাদ্ধ তর্পণ করা হয়েছে সেগুলো সার্থক। তাঁরা অবশ্যই আমার কাছে তৃপ্তি লাভ করেছেন। নিশ্চয়ই তাঁদের আশীর্ব্বাদের

ফলে আপনার পদার্পণ। আমার কুল আজ পবিত্র হয়ে গেল আপনার দর্শনে। আপনার আগমনে আমাদের যজ্ঞ সুসম্পন্ন হলো বলে আমার মনে বড়ই তৃপ্তি লাভ করছি।

দাতার প্রশংসা সকলেই করে। দানের মত আর কি আছে? দানে যে দেয় তার মনকে প্রসন্ন করে, যে পায় তাকে পুষ্ট করে। যে অনুমোদন করে তার ধর্ম্ম লাভ হয়। যে ব'লে ক'য়ে দান করায় তারও পুণ্য হয়। দানের ফলেই যত হিতকর কর্ম্মের প্রবর্ত্তন। স্কুল বল, হাসপাতাল বল, লাইব্রেরী বল, অত বড় বড় আশ্রম গুলি, মন্দির, তীর্থস্থানের যত কিছু সবই তো দানের উপরই নির্ভর করে! এই যে আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন বাড়ুয্যে মশায়,—আমি সুন্দরী বাবুর কথাই বলছি, তিনি যদি মুক্ত হস্তে দান না কর্ত্তেন, তোমাদের গ্রামের হাসপাতালটির কোন অস্তিত্ব থাকতো কি? আর এই শীলেদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কতদান পুণ্যই না করে গেছেন, আহা! তাদের কথা স্মরণ করলেও পুণ্য হয়। তারা সব প্রাতঃস্মরণীয় লোক ছিলেন। কিছুদিন আগে আমি একটি গ্রামে গিয়েছিলুম কথকতার আহ্বানে। দেখলুম, সে কি একটা বড় দীঘি! জিজ্ঞাসা করলুম এটা কাদের? গ্রামের লোকেরা বল্লে ঠাকুর মশায়, সে আর বলব কি, ঐ দীঘির জল নিয়েইতো এখন গ্রামের সব লোকের কাজ চলছে। ঐ দীঘি এই দু'বছর হলো দালালদের দানে প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এরাই গ্রামের জলকষ্ট নিবারণ করেছেন। জলই বল, ভূমিই বল, অন্নই বল, বস্ত্রই বল, দানের মত ধর্ম্ম নেই। হায়রে দেশ, এখন সব দাতারা কোথায় গেলেন! এই সেবারে আমি রামপুরে বামন-ভিক্ষা কথকতার

দিনে এক দিনেই পেয়ে ছিলাম পঁচিশ খানার উপরে বস্ত্র আর প্রায় চারমণ চাল। থাক সে সব কথা এখন যেন মানুষের দানের ভাবটাও ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। দোষ আর দিই কাকে, সবই কালের প্রভাব। যাঁরা আজকে বামনদেবের ভোজ্য এনেছেন, তাদের আর কাল আন্‌তে হবে না। যাঁরা পারেন নি, আগামী কাল নিয়ে আসবেন। এই দান যে বামনদেব গ্রহণ করবেন।

দেখ বলিরাজ—সম্মুখেতে আজ
বামনের সাজ পরম পুরুষে।
মহারাজাধিরাজ, দেবতার কাজে,
ভিখারীর সাজে, তোমারে সাধিছে॥
দাতাকুল মণি ধন্য রাজা তুমি
বাক্য তব কভু অন্যথা না হয়।
এই দৈত্য কুলে কত ধর্ম্ম কর্ম্মে রত
জনমিলা শ্রেষ্ঠ পুরুষ নিচয়॥

বৈকুণ্ঠের সেবক তুই মহাবলবান
জয় বিজয় নামে মহাকীর্ত্তিমান।
ঋষি অভিশাপে দৈত্যদেহ ধরে
যুদ্ধ অভিলাষ বিষ্ণুর করিলা পূরণ॥
হিরণ্যাক্ষ লাগি বরাহরূপে হরি
সাগরের জলে করয়ে প্রবেশ।
শ্রীহরির খেলা অনন্ত সে লীলা
বেদ পুরাণে নাহিক শেষ॥

সেই সত্য যুগের কথা একদিন চতুঃসন ব্রহ্মার চারিপুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার বৈকুণ্ঠের দ্বারে উপস্থিত। দ্বারী জয় বিজয়। সাধুদের নগ্নমূর্ত্তি দেখে জয় বিজয়ের মনে কুণ্ঠার উদয় হল। বৈকুণ্ঠের দ্বারীর এ কুণ্ঠা মোটেই শোভা পায়না। তাঁরা ভগবানের দর্শনে ইচ্ছুক চতুঃসনকে বাধা দিলেন। মন্দিরের ভিতর যাইতে দিলেন না। শান্ত ভাবের উপাসক চতুঃসনেরও কি জানি কোন্ মায়ার প্রভাবে প্রাণের মধ্যে ক্রোধের অশান্ত বেগ উপস্থিত হল। তাঁরা রাগ করে অভিশাপ দিলেন—জয় বিজয় রে তোদের আর বৈকুণ্ঠে বাসের অধিকার নেই, যা তোরা অসুরভাব লয়ে বৈকুণ্ঠ হতে দূর হয়ে যা। দানবদেহেতে তোদের জন্ম হবে। প্রিয়-সেবক জয় বিজয়ের প্রতি অভিশাপ হওয়া মাত্র ভগবান ছুটে এসে দাঁড়ালেন ঋষিদের সম্মুখে। তাঁরাতো ভগবানকে দেখে তখনই তাঁদের ভুল বুঝতে পারলেন, তাঁরা করযোড়ে ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইলেন—প্রভু হে, না বুঝে আমরা ক্রোধের বশীভূত হয়েছি, বড় অন্যায় হয়েছে। প্রভু, তুমি ক্ষমা কর। জয় বিজয় প্রভুর চরণে লুণ্ঠিত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। কেমন করে বৈকুণ্ঠ দর্শন হতে বঞ্চিত হয়ে দিন যাবে? প্রভু, কেন আমাদের মনে সাধুদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব জাগল? আমাদের কি উপায় হবে প্রভু, বলে দাও। তখন প্রসন্ন বদন ভগবান বল্লেন—ভয় নাই জয় বিজয়, তোমরা তিন জন্মের পর আবার আমার সঙ্গে এসে বৈকুণ্ঠে বাস করবে। তোমাদের এই অসুরদেহে জন্ম আমার যুদ্ধ-বাসনা পূর্ণ করবার জন্য আমারই অভিলষিত। ঋষিগণ, আপনাদেরও কোনো দোষ নাই। আপনাদের ক্রোধ আমার বৈষ্ণবীমায়ার প্রভাবেই সৃষ্ট। আপনারা শান্ত মনে স্ব স্থানে গমন করুন।

সেই অভিশপ্ত জয় বিজয়—হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্য-কশিপু। হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছেন, ভগবান বরাহ মূর্ত্তি ধরে। সেই যজ্ঞ-পুরুষের আবির্ভাব কথা বলব আর একদিন। হিরণ্যকশিপুর কথা কে না জানে, যাঁর পুত্র জগৎ বিখ্যাত পরমভাগবত প্রহ্লাদ মহাশয়। এই প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন। আর বিরোচনের পুত্র বলিরাজা। তাইতো ভগবান বামনমূর্ত্তিতে তার দ্বারে ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছেন। এই বংশের সঙ্গে যে ভগবানের তিন পুরুষের সম্বন্ধ রয়েছে। সে সম্বন্ধ অস্বীকার করবেন কেমন করে ?

ঠাকুরের কথাগুলি এমন চমৎকার হচ্ছিল যে, সভা তখন নিস্তব্ধ। মনে হয় একটি ছুঁচ পড়লেও তার শব্দ শোনা যাবে। এমন সময় কোথা থেকে একটি পাগল নগ্নবেশে সর্ব্বাঙ্গে ধুলামাখা এসে উপস্থিত সেই সভায়। সে কখন জানি সকলকার অগোচরে ধীরে ধীরে ঠাকুরের ঠিক আসনের কাছে এসে জুটেছে আর সাজানো সিধের ওপর থেকে কয়েকটি ফল কলা হাতে করে তুলে নিয়েছে। হঠাৎ মৃদঙ্গ বাদকের সে দিকে নজর পড়ে যেতেই সেতো একেবারে উগ্রমূর্ত্তি ধরে তাকে আক্রমণ কর্ত্তে ছুটেছে। আহা হা কথাটা মাটি হলোরে। ঠাকুর বলেন—আরে থাম, থাম, মারিস্‌নে—মারিস্‌নে। ওরে, ঐ যে ভগবান ! ঐ যে ভগবান ! আহা আহা, ভগবান আজ তোদের কাছে ঐ পাগলার মূর্ত্তিতেই এসেছেরে—আমার কথা শোন—কথা শোন। ওকে খেতে দে-রে—খেতে দে। ওকে খাওয়ালেই ভগবান খাবেন রে ভগবান খাবেন।

আমি স্তব্ধ হয়ে শুধু সেই নবীন কথকের কথাগুলি শুনছিলাম, আর ভাবছিলাম—এ কথকঠাকুর শুধু অভিনয়ই করেন না। এই

কথার সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ আছে। যিনি সর্ব্বজীবে ভগবানকে দেখবার মত প্রাণ পেয়েছেন, তিনি প্রকৃতই সাধু। আমাদের স্বার্থে হাত পড়েছেতো সব কিছু ভুল হয়ে যায়। কথক ঠাকুরের ফলগুলি ঐ পাগলটা নিয়ে যাচ্ছিল, কোথায়, তার মনের তো কোন বিচলিত ভাব দেখা গেল না। তিনি সত্যই একজন সাধুপুরুষ।

ঠাকুর গান ধরেন—

চিনিনা তোমারে, ওহে নারায়ণ…
সর্ব্বভূতে তুমি, কর অবস্থান…,
যে জানে তোমারে, ত্যজিয়া সংসারে…
ভজে তোমার ঐ রাঙ্গা শ্রীচরণ।
জলে স্থলে কিংবা অনলে অনিলে
প্রাণ রূপে আছ সর্ব্ব চরাচরে
আছ নানা রূপে ঘটে মঠে পটে
তুমি সর্ব্বব্যাপী তুমি সনাতন ॥

ন হ্যেতস্মিন্ কুলে কশ্চিন্নিঃসত্ত্ব কৃপণঃ পুমান্
প্রত্যাখ্যাতা প্রতিশ্রুত্য যো বা দাতা দ্বিজাতয়ে ॥

তোমাদের কুলে প্রাণবান শ্রেষ্ঠ দাতৃগণের জন্ম হয়েছে। এ বংশে কেউ কখনো কৃপণ নয়। তাদের কাছে যা চাওয়া গেছে একবার দেবো বলে আর কখনো অন্যথা করে নি। সুচতুর ছলনাময় বামনদেব আগে থেকেই কথার বাঁধনে বলিকে বেঁধে রাখছেন, এমন করে যে, একবার ভিক্ষা দেবো বলে আর সে কথা তিনি কোনোমতে

কারুর পরামর্শে বা ভয়ে ফিরিয়ে নিতে না পারেন। ধন্য লীলাময় তোমার লীলা! যুগে যুগে তোমার ভক্তদের সঙ্গে এই খেলা খেলেছ। আর ভাই দাতা হওয়া কি মুখের কথা? দাতা হয়েছিলেন দাতাকর্ণ—দাতা হয়েছিলেন শিবি মহারাজ, দাতা ছিলেন জীমূত বাহন, আর দাতা ছিলেন দধীচি মুনি। প্রাচীনেরা বলেন—

কর্ণস্ত্বচং শিবির্মাংসং জীবং জীমূতবাহনঃ।
দদৌ দধীচিরস্থীনি নাস্ত্যদেয়ং মহাত্মনাং॥

দাতাকর্ণ শুধু পুত্রদান করেই নয়, তার নিজের দুর্ভেদ্যকবচ যেটি তার শরীরের চামড়ার সঙ্গে ভিন্ন ছিল না, সেই চামড়া দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করেছেন। একটি ছোট পায়রার প্রাণরক্ষা করবার জন্য কেমন করে ধীরে ধীরে শরীরের মাংস কেটে কেটে তুলাদণ্ডে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে শিবিরাজা প্রস্তুত হয়েছিলেন, সে কথা তো সকলেই জানেন। জীমূত বাহন তার প্রাণ দান করেছেন।

দেবতার জন্য দধীচির অস্থি দানেই বজ্রের সৃষ্টি। দাতার মত আর গৌরব কার আছে? ধন্য বলি! তুমি আজ শ্রীলক্ষ্মীর বক্ষঃস্থলস্থিত কুঙ্কুমরাগ রঞ্জিত সেই সুন্দর নারায়ণের বক্তিমাভাযুক্ত করকমলকে ভিক্ষা পাত্র রূপে পরিণত করেছ—তোমার উদার মনের পরমাগ্রহে—

লক্ষ্মীপয়োধরোৎসঙ্গকুঙ্কুমারুণিতো হরেঃ
ধন্যো বলিঃ স যেনাস্য ভিক্ষাপাত্রীকৃতঃ॥

শত শত মানুষের মধ্যে একজন বীরপুরুষ হয়, সহস্রের মধ্যে একজন পণ্ডিত পাওয়া যায়, দশ হাজার লোকের মধ্যে একজন

সুবক্তা পাওয়া যাইতে পারে, দাতা, সে পাওয়া যায় কিনা যায় ; সে যে অত্যন্ত দুর্লভ।

হে বৈরোচনি, তোমার পিতা বিরোচন ব্রাহ্মণ বেশধারী দেবতাদের প্রার্থনায় নিজের আয়ুদান করেছিলেন। তুমি তার উপযুক্ত পুত্র। দান কর্ব্বার আগ্রহ তোমার স্বাভাবিক। তুমি গৃহস্থের সকল কর্ম্মই সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠান করেছ। দানেও তোমার অকুণ্ঠ মতি। তুমি তো মস্ত বড় দাতা। তোমার কাছে আমি আর কি দান চাইব বল ? তুমি তো সমস্ত জগতের মালিক হয়েছ। স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালের তুমি একছত্র অধীশ্বর। তা বলে আমি তো আর তোমার কাছে বেশী কিছু চাইতে পারিনা। প্রয়োজনের বেশী চাইলে যে আমার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নষ্ট হয়ে যাবে।

আমার এখন প্রয়োজন একটু জমির। বেশী নয়, এই আমার পায়ে তিন বার ফেলে যেটুকু অর্থাৎ ত্রিপাদ ভূমি আমি ভিক্ষা চাই।

তস্মাৎ ত্বত্তো মহীমীষদ্ বৃণেহং বরদর্ষভাৎ।
পদানি ত্রীণি দৈত্যেন্দ্র সংমিতানি পদা মম॥

কথাটা বেশ জমে উঠেছে। শ্রোতারা একমন হয়ে শুনছে। এমন সময় সাধুসান্ন্যাল সভাথেকে উঠে পড়লেন। তিনি যেন কি বলতে বলতে সভাথেকে বেড়িয়ে গেলেন। তার সঙ্গে আরো দুএক জন আসন থেকে উঠছিলেন কিন্তু ঠাকুরের কণ্ঠের মাধুর্য্যে আর তাদের যাওয়া হলো না। পরদিন সান্ন্যাল মশায়ের কথা শুনলুম। বার বার ঐ দান আর দাতার কথা বলাতে তিনি অত্যন্ত চটে গেছেন। এই গ্রামের সকলেই জানে সাধু সান্ন্যালের

মত কৃপণ আর কেউ নেই। সেই সান্ন্যালের সামনে অত দানের কথা, তাই ঐ কথা তার ভাল লাগেনি। তিনি আরো ভয় করছিলেন, এর পর কথক যদি সভার দিকে লক্ষ্য করে দানের কথা কিছু বলে ফেলেন, তাতে বেশী করে লাগবে এই সান্ন্যালের। কেন না এ লোকটি বামুনের নিন্দা আর ঠকিয়ে দান নেওয়ার কথা বলে বলে এমন অভ্যস্ত যে, সে সব কথা বলা মাত্রই তার মনে হয়, তাকে লক্ষ্য করেই বুঝি দোষারোপ করা হচ্ছে।

আরো একবার এক সভায় কৃপণের নিন্দা শুনে তিনি ভীষণ ভাবে চটে গিয়েছিলেন, আর সেই থেকেই গ্রামের লোক তাকে ভাল ভাবে কৃপণ বলে চিনে নিয়েছে। সভা থেকে উঠে যাবার সময় কিন্তু দেখা গিয়েছে কয়েকজন লোক যেন ইঙ্গিত করে তার সম্বন্ধে কি সব বলাবলি করছিল।

নন্দীদের বড় মেয়ে সন্ধ্যার গাড়ীতে শ্বশুর বাড়ী যাবে। তার সব গুছিয়ে দিতে হবে বলে গিন্নীমার একটু আগেই বাড়ী ফিরে যেতে হচ্ছে। তিনিই সব্বার আগে দাঁড়ালেন সিধের ডালাটি দুহাতে করে। তার ডালার ভেতর চাল ডাল তেল নূন মশল্লা গব্যঘৃত তৈল আলু কুমড়ো সবই আছে। সঙ্গে এক খানা ছোট গীতা একটি পৈতে আর একটি ক্ষুদ্র চামরও রয়েছে দেখা গেল।

কথকঠাকুর হাত বাড়াতে নন্দী গিন্নী তার হাতে সেটি দিলেন। কাছেই পালেদের মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল, ঠাকুরের সেবায় সে সব সময় কাছে কাছেই থাকে। সে ঐ সিঁধেটি ঠাকুরের হাত থেকে নিয়ে এক পাশে তুলসী মঞ্চের ধারে রেখে দিল। কাপড় একখানা তার সঙ্গে একটি রূপোর টাকা একটি

তামার পয়সা আর একটি সোনার তুলসীপাতা কাগজে মোড়া এগুলিও ঠাকুরের হাতে দিলেন নন্দর মা। ঠাকুর এগুলি নিজের পাশেই আসনের উপর রেখে দিলেন। বামন ভিক্ষার কথাতো পড়ে রইল সেদিনের মত ঐ পর্য্যন্ত। নন্দী গিন্নীর পর মেয়ে মহলে ক্রমশই চঞ্চলতা ঘনিয়ে উঠলো। এক এক করে মায়েরা সব ডালা থালা চুপরি রেকাব করে সিঁধে নিয়ে এগুতে শুরু করলেন আর তখন কথকতা চলে ? ডাব আর নারিকেল স্তূপীকৃত হতে থাকলো ঐ তুলসী মঞ্চের এক পাশে। কত যে ফল আর মিষ্টি সে আর কি বলবো! ক্রমশই ভীড় কে কার আগে ঠাকুরের পায়ে নমস্কার কর্ব্বে তাতে আবার এক জনের নমস্কারেই দু'চার মিনিট কেটে যায়, কি তাদের ভক্তি আর কত সরল তাদের প্রাণ। একটি মেয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে আঁচলে চক্ষের জল মুছে কাঁদছিল। ঠাকুর তাকে ডেকে মধুর কণ্ঠে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—মা কেঁদোনা সংসারের জন্য সকলেই কাঁদে। তোমার যে বিপদ হয়েছে, আহা, এরূপ বিপদ সত্যই খুবই দুঃখের। এই অল্প বয়সে স্বামীহারা, তাতে তোমার একমাত্র ভাইটি। সে নাকি খুব ভাল ছেলে ছিল। আমাকে তোমারই মাসীমা বলেছে। আহা সে চলে যাওয়াতে তোমাদের বড়ই কষ্ট হয়েছে। তোমার মা, তাকে তো আর কোনো কথা বলে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছিনা, তবে তাকে বলো যে—এখন তিনি যেন ভাবেন, আমার ছেলে জগন্নাথের সঙ্গেই আছেন। জগন্নাথকে চিন্তা করলেই পুত্রের শোক তিনি সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বেন। এছাড়া আর কিছু বল্‌বার নেই।

বামনকে ভিক্ষা দেবার ঔৎসুক্যে সে দিন আর বামন ভিক্ষা

কথাটুকু শেষ পর্য্যন্ত শোনাই হলনা। রাত্রিতে বাড়ী এসে ভাবলুম, এই মাষ্টারী করে আমি সংসার চালাতে কত অসুবিধা ভোগ করছি, আর কথকঠাকুর অতি অল্পেই বেশ খাদ্য বস্ত্রের সমাধাঁন করে নিচ্ছেন। 'বামন ভিক্ষা' আর 'রুক্মিণী বিবাহে'র কথকতা শিক্ষা করে যদি গ্রামে গ্রামে প্রচার করা যায়, তাহলে গ্রামের লোকেরও মঙ্গল হয়, আর নিজেরও দু'পয়সা লাভ হয়।

(৪)

কথকতার সঙ্গে আরো মধু রসের সংযোগ স্থাপন করেছিলেন বাংলার পাঁচালী গায়কেরা। ছন্দোবদ্ধ বাক্য আর সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর সুন্দর গান। শ্রোতাদের চমক লাগিয়ে দিতে বাগ্‌বিন্যাস চাতুর্য্যে এই পাঁচালীর গায়ক দাশুরথি রায় প্রভৃতি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। জন-শিক্ষা ক্ষেত্রে ইঁহাদের দান অবর্ণনীয় প্রভাব বিস্তার করে লোকচিত্ত জয় করেছে। ইহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে কথকঠাকুরেরা অলৌকিক শক্তি বা বিদ্যার গুরু, কেহ হাত দেখায় সিদ্ধহস্ত, কেহ বা মনোগত প্রশ্নের সমাধান করে দিতে অত্যন্ত নিপুণ। আবার কাহারও সিদ্ধ কবচ ছিল অব্যর্থ ফলপ্রদ। ইহা ছাড়াও টোট্‌কা ঔষধ গাছ গাছরার গুণ, জল পড়া, তেতুল পড়া, এসব তাদের জন কল্যাণ-হেতু অনায়াস লব্ধ সিদ্ধবিদ্যা। একজন কথকের কথা শুনেছি—তিনি নাকি বশীকরণে এরূপ পারদর্শী ছিলেন যে, কোনো সময় তাঁর এই শক্তির প্রভাবে এক খণ্ড পাথরও আকৃষ্ট হয়ে তাঁর ইচ্ছায় তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল। আমাদের মন সন্দেহে ভরা কাজেই

কথাটা ভাল করে হজম করা তখন সম্ভব হয় নি ; তবে অনেক দিন পর বুঝে ছিলাম, পাথর আকৃষ্ট না হলেও ভাল কথকের কথায় বা গানে পাথরের চাইতেও কঠিন মন মানুষের আকর্ষণ বা বশীকরণ সম্ভব হয়। বশীকরণের জন্য বগলামুখী কবচ পাঠ বা জড়ি বুটি ধারণ বা কোনো সিদ্ধ ফোঁটা ধারণ করবার প্রয়োজন পড়ে না। প্রীতিময় ব্যবহার, মধুময় কথা, আর প্রাণভরা গান, অনায়াসেই মানুষের মন হরণ করে নিতে পারে।

সেকেলে কথকেরা কেমন ছিলেন, তা ভাবলে আশ্চর্য্য বলে মনে হবে। সেই প্রাচীন রঘু ডাকাতের কালের এক কথক। এমন লোক নেই যে তার গান শুনে মুগ্ধ না হয়। রুক্মিণী বিবাহের যৌতুক আর মেলাই গওনা পত্র টাকা পয়সা নিয়ে বৃদ্ধ কথক বাড়ীতে এলেন।

সংবাদ গেল রঘু ডাকাতের কাছে। সে তো পত্র দিয়ে কথক-ঠাকুরকে জানিয়ে দিলে আগামী অমুক বারে অমুক তারিখে আমরা সদল বলে আসবো। কথকতা করে যা আনা হয়েছে স্বেচ্ছায় সেগুলো আমাদের দিয়ে দিতে হবে, যদি কোনো বাধা দেওয়া হয়, তবে প্রাণ হানির সম্ভাবনা আছে। আর পুলিশে খবর দিলে এ গ্রামে ভবিষ্যতে বাস করাই সম্ভব হবে না। সপরিবারে মৃত্যু অনিবার্য্য। পত্র পেয়ে কথকঠাকুর ভাবলেন, রঘু ডাকাতের সঙ্গে যে কোনো রকমে বিরোধিতা করা অমঙ্গলের কারণ হবে। থাক্‌গে ভগবানের নাম স্মরণ করে দেখা যাক্ কি করা যায়। যে দিন ডাকাত দলের আসবার কথা তিনি সে দিন নিজের বাড়ীর আঙ্গিনায় সুন্দর একটি আসর তৈরী করে—কথকতার বেদী তৈরী

করে তার পাশে বাড়ীর সমস্ত দামী জিনিষ পত্র আর সোনা গওনা সাজিয়ে রাখলেন। এই ভাবে সব গুছিয়ে তিনি এক পাশে বসে রূপোর আলবোলা হুকোয় বেশ সুগন্ধি তামাক সেবন করছেন আর যেন সেই অতিথি দলের প্রতীক্ষা কবছেন। বেশ আলোর ব্যবস্থাও ছিল নতুন পাওয়া জিনিষ পত্রগুলি আলোয় ঝিক মিক্ করছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ডাকাতের দল মশাল হাতে হৈ হৈ করে বাড়ীর উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো, কি ভয়ঙ্কব তাদের দর্শন আর উদ্দণ্ড প্রচণ্ড ভাব যেন ঠিক সেই দক্ষ যজ্ঞের কাণ্ড সুরু হলো কথকঠাকুরের বাড়ীব উপরে। রঘু ডাকাত স্বয়ং সেই ঠাকুরের কাছে এসে বললে—কি হে গুরু ঠাকুর, কি মনে কবেছ? •একেবারে যে নিশ্চিন্ত দেবশর্ম্মা হয়ে তামাক টানছো ; বলতো তোমার মনের ভাবটি কি? সব জিনিষ পত্র বার করে দিবে, না জোর করে সব নিতে হবে। ব্রাহ্মণ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেন—বাবা বঘু তোমার জন্য যে আমি সব কিছুই সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে দিয়েছি, তুমি এখন গ্রহণ করলেই আমি সুখী হই। কথা শুনে রঘু চটে গিয়ে বলে—ঠাকুর এখন আর মুরব্বীয়ানা করে বামুনতালি কর্ত্তে হবে না। জান তো এই রঘুব কাছে কারুব রেহাই নাই। তাড়াতাড়ি বল তোমার কি বলবার বিষয় আছে। ব্রাহ্মণ কথক বলেন অক্ষুব্ধ অচঞ্চল কণ্ঠে ধীর ভাবে—রঘু, তুমি তো সবই নিবে, কিন্তু একটা কথা তোমায় বলতে চাই। আমি কি করে এই সব বহুমূল্য সামগ্রী রোজগার কবে নিয়ে আসি, সেটি যদি তুমি দেখতে তাহলে হয়তো আমার পরিশ্রম লব্ধ এই সব জিনিষ তুমি নিতে চাইতে না। এসেছ, এগুলি তুমি নিয়ে যাও, তার আগে একবাব শান্ত

হয়ে বসে আমার কথা একটু শোন। রঘু বিরক্ত হয়ে বলে—বল বল ঠাকুর কি বলতে চাও।

কথকতার বেদীতে বসে তন্ময় হয়ে সেই লোকপ্রসিদ্ধ কথক একখানা গান ধরলেন। ডাকাতের দল স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগল। সেই গানের সুরে কি কারুণ্য, কি আর প্রাণ গলানো ভাব—ধীরে ধীরে রঘু ডাকাতের চোখ বুজে আসছিল, শুধু তাই নয়, তার তন্ময় মুখের উপর যেন কি এক দিব্য দর্শনের প্রভাব পড়ে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন এনে দিচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল সেই বজ্র কঠোর রঘু ডাকাতের চোখের কোণে জলের ধারা প্রবাহিত। একি, ডাকাত রঘুর প্রাণে আজ কোন্ বীণার তারে হাত পড়েছে, কোন ঝঙ্কারে কোন সুর বেজে উঠল। ধীরে ধীরে গানের মাধুরী ডাকাত দলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। তারা মন্ত্র মুগ্ধ। তাদের বাহিরের বৃত্তি লোপ। এ গান যে তারা কখনো শুনেনি। এ যে অনাদি মানব মনের চিরন্তন চাহিদার গান। যে গানে পাষাণ গলে যায়, মরুভূমিতে বান ডাকে, শুকনো গাছে ফুল ফোটে, এ যে সেই হরিনামের গান। গানের প্রভাব অফুরন্ত, গান থেমে গিয়েছে। রঘু ডাকাতের চোখ এখনও খোলেনি। কিছুক্ষণ বাদে যখন সে বাহ্য জ্ঞান ফিরে পেয়েছে, তখন সে আর আগেকার মত ডাকাত রঘু নেই। সে তখন বিগলিত-চিত্ত ঠাকুরের পরমভক্ত রঘুনাথ। সে ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলি নিয়ে বলে—তা আজ আর তোমার এই পার্থিব ধন সম্পদে আমার লালসা নেই। তুমি আমায় পরমানন্দময় ভগবানের নামামৃত পান করিয়ে দিয়েছ। আজ থেকে রঘু তোমার শিষ্য।

(৫)

গ্রামের প্রাধানিক ব্রাহ্মণগণ এক কথক ঠাকুরের সম্বন্ধে কোন সময় কিছু বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করে বলেন—ঐ পুরাণ কথা আর শুনবো কি ? রোজ এক পূতনা-বধ আর বামনভিক্ষা। তার চাইতে ঘরে বসে একটু আরাম করা ভাল। কথাটা আমাদের কথক ঠাকুরের কাছে পৌঁছালো। তিনি পরদিন প্রাতঃকালে অতি বিনীত ভাবে সেই ব্রাহ্মণ গৃহে স্বয়ং উপস্থিত। বাড়ীর সকলেই অনিমন্ত্রিতভাবে কথক ঠাকুরের আবির্ভাব দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত। তাহার রূপ গুণ সাধারণ সকলকেই মুগ্ধ করেছে। বাড়ীব কর্ত্তা আসন ত্যাগ কবে এলেন তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসাবার জন্য। সেখানে তিনি মধুব বাক্যে বলেন—শুনলাম, আমার পুবাণ কথা বা পুরাতন কথা শুনতে আপনাদেব মোটে আগ্রহ নেই। সে জন্যই আমি এসেছি বলতে—যদি আপনাবা অনুগ্রহ করে একবাব কথা শুনতে যান, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আপনাদের আমি নতুন কথাই শুনাবো। সত্যই সেইদিন কথক ঠাকুর স্বরচিত পদাবলি আর অতি অদ্ভুত অশ্রুতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দিয়ে কথা শুরু করেন।

"মানুষের জীবনে নিত্য নবভাবের পরিস্পন্দন। যে দিন যায় সেটিকে সে মনে রাখিতে চায় না। নূতনেব আকর্ষণ তাহাকে গত জীবনের দুঃখ হইতে রক্ষা করে" এইসব উল্লেখ করে কথকতা এমন রসাল করে দিলেন যে, সভা থেকে আর কারুব উঠে যাবার মন হয়নি। এমন কি সেদিন সেই গ্রামের যত কুলীন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সজ্জন সকলের মুখেই শুনা গেল, এমন কথা আর কখনো হয়নি, ধন্য ধন্য কথক চূড়ামণি।

গ্রামের প্রান্তে বিস্তৃত ধানের ক্ষেত আব তাহারই পর পদ্মা নদী। এই নদীর ধারেই খুব বড় বাজার। এখানে গরু ছাগল থেকে ধান পাট সব কিছুই আমদানি রপ্তানি হয়ে থাকে প্রতি মঙ্গলবারে। বড় বড় ধনী মহাজন। তাদের ভিতর স্কুল কলেজে পড়া বিদ্যাধর খুবই অল্প সংখ্যক কিন্তু ধর্ম্ম ধুরন্ধর অনেকেই আছেন। এদের একটি কীর্ত্তন মণ্ডলী আছে। প্রতি বৃহস্পতিবার এই হরিনাম দলের কীর্ত্তন হয়। নারায়ণের সিন্নি আর হরিনাম কীর্ত্তন নিয়মিত ভাবে সাধারণের সহায়তায় অনেকদিন ধরেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাজারের মোড়লেরা ঠিক করেছেন, তাদের ব্যবসায় সংক্রান্ত নৌকা ভাল ভাবে এসে পৌছালে প্রতি নৌকার জন্য একটি করে টাকা নারায়ণ সেবায় দেওয়া হবে। এই নীতি অনুসরণ করার ফলে কোনোদিন নারায়ণ পূজায় প্রাচুর্য্যের অভাব হয়নি। পুরোহিত বড় ভাল মানুষ। তিনি নিজে হাতে সব কিছু যোগাড় করে পূজা করেন। তা ছাড়া পুঁথি পড়বার সময় পাঁচালী ছন্দটা তাঁর কণ্ঠে এমন সুন্দর শ্রুতি-মধুর হয়ে উঠে যে তা আর কি বলবো। একদিন তাঁর পড়বার ভঙ্গীটিকে প্রশংসা করে মহাজনেরা সকলেই অনেক বলাবলি করেছিলেন। পুরোহিত ঠাকুর বলেন—আরে আপনারা আমার মুখে সত্যনারায়ণ পাঁচালী শুনেই অত আনন্দ পেয়েছেন, আমার গুরুদেবের মুখে যদি একবার কথকতা শুনতেন তবে না জানি আপনারা কি বলতেন? একজন প্রধান মহাজন তার নাম চুনীলাল সাধুখা, বলে উঠলেন, আরে বলুন তো তাঁর নামটি কি? আমি একবার এক মোকামে গিয়ে কথকতা শুনেছিলাম—সে বড় মধুর, বড় মধুর, তা আমাদের এখানে বাজারে

একবার আয়োজন করলে মন্দ হয় না। কথা বলাও যা কাজেও তা। অমনি স্থির হয়ে গেল পুরোহিত ঠাকুর তাঁর গুরুদেবকে নিয়ে এসে বাজারে কথকতা শুনাবেন। প্রথমে তো এক মাসের জন্যই ব্যবস্থা হয়ে গেল। তার পর এর দোকান ওর দোকান করে প্রায় আড়াই মাস কথকতা চলেছিল। শুধু বর্ষার আগমনের জন্য সেবারকার একটানা আনন্দ বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। আহা সে কথকতার সুর এখনও কানে লেগে আছে।

মনে আছে মহাজনেরা সব মিলে খুব বিরাট ভাবে একটা মহোৎসবের আয়োজন করেন। সে সময় তো আর রেশনকথা লোকে জানতো না। বস্তাভরা চাল ডাল স্তূপাকার হলো। একঘর কুমড়ো, আলু, আর বেগুন। শাকও নানারকম এসেছে। তেল ঘৃত সবই মজুত। উৎসব তো হবে কিন্তু কথক ঠাকুর এক বায়না ধরে বসেছেন। তার কথা—এ রকম উৎসব তোমরা করছ দেখে আমি মনে খুব উৎসাহ পাচ্ছি বটে, তবে আমার আদর্শ হয়তো এখনো তোমরা ধরতে পারনি। এই যে আড়াই মাসকাল আমি এই বাজারে কথকতা করছি তার কোনো স্থায়ী ফল এই মহোৎসবের অনুষ্ঠান দ্বারা লোক পাবে কি? মানুষ সকলেই নিজের নিজের বাড়ীতে খায়; সুখে দুঃখে এক ভাবে চলে যায়, তাদের একদিন মহোৎসবের খিচুরী আর লাফড়া খাইয়ে তোমরা তাদের কি উপকার কর্ব্বে? প্রধান পাণ্ডারা সব এসে ঠাকুরকে ঘিরে বসলেন, তাদের সকলেরই মুখে এককথা মহোৎসব না হলে যে আমাদের মাথা কাটা যাবে। ঠাকুর আপনি বলেন কি?

হ্যাঁ আমি বলি—মানুষ যা করে ও ভাবে সবই তার প্রয়োজনের

খাতিরে শুধু তাই নয়, অনেকটা তার দুঃখ পরিহারের জন্যও—অধ্যাত্ম ভাবের অনুশীলনে ও তার প্রসারে। এ কথাটা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, এর মূলে রয়েছে অফুরন্ত বাসনা আর অনুভূতির সুতীব্র লালসার চেতনা। সৃষ্টি রহস্যে এই কথাটাকে ভুলে যাওয়া অসম্ভব। মানুষেব ধর্ম্মচিন্তা ও বিশ্বাসের গোড়ায় যে অদ্ভুত সব বাসনার বহুমুখী ধারায় প্রবর্ত্তন সেগুলো সামগ্রিক ভাবে ধারণা কবা কঠিন। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায়, মানুষের ধর্ম্মবোধের মূলেও কতগুলো অভাব মোচনের কথা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। মৃত্যুভয় মানুষকে ধার্ম্মিক করিয়া তোলে. অনেক ক্ষেত্রে অর্থের আকর্ষণও ধর্ম্ম-উদ্বোধক। রহস্য জিজ্ঞাসুও ধার্ম্মিক হয়। জ্ঞানীব তো আব কথাই নেই। জ্ঞানেব জন্য যে ধর্ম্মের—দর্শনের—অধ্যাত্মবাদের অনুশীলন এটাতো একান্ত স্বাভাবিক। এই ধর্ম্মভাব কাহারও উপদেশে কাহারও উপরোধে নয়, এই ভাব স্বাভাবিক মানব মনের গঠন প্রণালীর বিশিষ্টতা রূপেই ফুটিয়া উঠে। সমাজ ও সংস্কার তাহার সহায়তা করে বহু ক্ষেত্রে। অনুকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও যে ক্ষেত্রে সেই ভাবের অভ্যুদয় দেখা না যায়, উহাকে অস্বাভাবিক বা অমানুষ বলে সাধারণত উপেক্ষা কবা হয়।

ঠাকুর খুব গভীর ভাবমগ্নের মত ধীরকণ্ঠে বলেন—তোমরা কি জান না মানুষের শরীরের চাইতেও মনটা কত বেশী মূল্যবান। আমি যে তোমাদের কাছে এতদিন ধবে কথকতা করছি তাতে কি মনেব সাধনার কথাই প্রধান করে বলা হয়নি? সেই মনের যদি উৎসব না হলো শুধু কি খাওয়া দাওয়া করেই মহোৎসব শেষ কর্ত্তে

হবে ? মানুষ বাইরের আনন্দ চায়, সে তো আর কারও অজানা নেই।

অভিনয়, সিনেমা, খাওয়া দাওয়া, এগুলি তো অতি সাধারণ কথা। এগুলোর জন্য শাস্ত্রের উপদেশ শুনতে হয় না। গুরুর উপদেশ—কথকতার শিক্ষা এই ভোগ সুখের দিকে মানুষকে টেনে নেবার জন্য নয়। মানুষের মনের দোষ দূর করাই শাস্ত্র নির্দ্দেশের মূল উদ্দেশ্য। পাঠ ব্যাখ্যা কথকতার আয়োজন, যত ধর্ম্মানুষ্ঠান, সবটারই উদ্দেশ্য মানুষের অধ্যাত্ম চেতনাকে জাগ্রত করা। তার অভ্যন্তরে যে আত্মজ্যোতিঃ আছে তাঁর প্রকাশ দর্শন করা। জীবনের রহস্য ভেদ করে সত্যানুভবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। নৈতিক জীবন গঠনের জন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠা। তোমরা যে উৎসবের আয়োজন করেছ তাতে এই জাতীয় কোনো কার্য্যক্রম আছে কি ? আমার মনে হয়, তার কিছুই নেই। সেই জন্যই আমি বলি, তোমাদেব এই রকম উৎসবের চাইতে স্থায়ী ভাবে জনসমাজের উপকারের জন্য কোনো উপায় অবলম্বন করা যায় কি না ভেবে দেখ। মহাজনেরা বলেন, ঠাকুর আপনাকে আমরা এতদিন ভুল বুঝেছি। ক্ষমা কর্ব্বেন, আমরা ভাবতুম কথকঠাকুর এসেছেন, ছুটো গান গেয়ে আর কথার ছলে মানুষের আনন্দ দিয়ে কিছু টাকা কামিয়ে নেবার ফিকিরে। আপনার মধ্যে যে জন-জাগরণের জন্য এমন একটি ভাব আছে, সেটি প্রথমটা আমরা বুঝতে তো পারিনি। আচ্ছা, তাহালে বলুন তো, আপনার মনের মত উৎসব কি করে করা যায় ? ঠাকুর ধীরকণ্ঠে বলছেন, তবে আপনারা শুনুন, আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়, আমি

সমগ্র সমাজের জন্য আমার জীবনটিকে উৎসর্গ করেছি। আমি যে পবিত্র ব্রত গ্রহণ করেছি, তা আপনাদের মত অর্থশালী ভক্তি-প্রাণ লোকের সহায়তা ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। আপনারা একটা কাজ করুন। যে টাকাটা আপনাদের এই উৎসবের চাঁদা রূপে তুলেছেন সেইটে দিয়ে এমন কাজ করুন যাতে চিরদিনের মত এই গ্রামের একটা উপকার হয়। এর জন্য চাই একটি ভজন আশ্রম প্রতিষ্ঠা। ঠাকুরের মুখের কথা উচ্চারিত হইতে না হইতে বিপিন বাবু বলে এক ব্যক্তি বলে উঠেন—ঠাকুর সেই আশ্রমের জন্য তো নিশ্চয় কিছু ভূমি সংগ্রহের প্রয়োজন। ঠাকুর যদি আদেশ করেন সেই জমির ভার আমি গ্রহণ করলাম, একবন্দে আমার ৫ বিঘা জমি ঠিক বাজারের গায়েই নদীর ধারে আছে। অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল, একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করি ঠাকুরের যদি ইচ্ছাই হয়েছে তো সেখানেই ঠাকুর যা হয় করুন না কেন? মহাজনদের প্রধান যশোদা মণ্ডল অমনি বলেন—জমি যদি বিপিন ভায়া দেন, মন্দির তৈরীর খরচ আমি বহন করলো। ঠাকুর কথক বলেন—শুধু একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠা আমার উদ্দেশ্য নয়। এমন অনেক বড় বড় মন্দির আছে যেখানে দিনান্তেও কোন লোক প্রবেশ করে না। সুবৃহৎ মন্দির রন্ধনশালা ব্যবহারের অভাবে দিন দিন মলিন হয়ে যাচ্ছে। মন্দিরের দেবতার পর্য্যন্ত যথোচিত সেবা পূজা হয় না। আমি সেই রকম আরো একটা মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য বলিনি। আমি চাই এমন কার্য্যক্রম যাতে করে নির্বাধরূপে চিরদিন জনসেবা চলতে পারে। এই কাজ করতে হলে প্রথমে চাই সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষার প্রচার, সঙ্গে সঙ্গে

কর্মের জন্য নিয়ন্ত্রণ। প্রচলিত শিক্ষার নীতি হইতে পৃথক ধরণের ধর্ম্মমূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা আমার আদর্শ। যাদের এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে তারা যেন জীবন পথে মানুষের মত মানুষ হতে পারে।

তারা হবে কর্মনিষ্ঠ ধর্মবিশ্বাসী সমাজ সেবক আর হবে গঠন মূলক কার্য্যোৎসাহী। কথক ঠাকুরের কথাগুলি সকলেই খুব মনোযোগ করে শুনছিলেন। শ্রেষ্ঠধনী হরকান্ত তালুকদার পিছন থেকে বলে উঠলেন—ঠাকুরের উদ্দেশ্য মহৎ। তাঁর কথা মত কাজ হলে সমাজের যথেষ্ট উপকার হবে এতে আর সন্দেহের অবসর নেই। বিদ্যালয় স্থাপনের প্রাথমিক ব্যয় যাহা প্রয়োজন আমি তার বন্দোবস্ত করিব। তবে বিদ্যালয়টি যেন আমার পূজনীয় পিতৃদেবের নামেই হয়। কথক ঠাকুর উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন—বেশ, প্রতিষ্ঠানের তো একটা নাম হবেই আপনার পিতার নামের স্মৃতি রক্ষা হবে সে তো ভাল কথাই। হরকান্তের প্রতিদ্বন্দ্বী অনন্তহরিবাবু বলেন—ঠাকুরের যদি একান্তই ইচ্ছা হয়েছে, তবে আমার সঙ্কল্পটাও বলি, আমার অনেক দিনের বাসনা এখানে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা হয়; এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সে রকম একটা কিছু করা যায় না কি? ঠাকুর বলেন—আরে আমি তো তাই চাই, সেই কথাই বলি—আপনাদের মন হলে কোন্ কাজটা না হয়? অনন্তবাবু এই ভার গ্রহণ করুন। কাজ শুরু হইয়া গেল। ঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া একটি কমিটি গঠন হইয়া গেল। অর্থ সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের কাজ আরম্ভ করা হইল।

ঠাকুর এখন আর কোথাও যান না। আশ্রমের উন্নতির জন্য সব সময় তাহাকে ব্যস্ত থাকিতে হয়। সংস্কৃতবিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছু চাষের জমি পাওয়া গিয়েছে তাতে দু বার ফসল হয়। আশ্রম বাসীদের আর বাইরে থেকে ধান কিনতে হয় না। তরিতরকারী যথেষ্ট হয়, বাগানে ফুলও ফোঁটে অজস্র।

সন্ধ্যা আরতির সময় কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠে নদীর ধারের নির্জনতা ভঙ্গ করে নিয়মিত সময়ে—আর তার কিছু পরে শুরু হয় ঠাকুরের কথকতা। আগে দেখেছি ঠাকুর শুধু কণ্ঠেই গান করিতেন। এখন একটি হারমনিয়াম হয়েছে। সেটি ঠাকুরের এক শিষ্য মেয়ের গান শিখবার জন্য কিনেছিল। ঘরে পড়ে নষ্ট হয় বলে ঠাকুরের আশ্রমে দেওয়া হয়েছে। একটি যুবক কলকাতায় বড় ওস্তাদের কাছে এসরাজ শিখে এসেছে। সে এখন কথকতার সময় তার যন্ত্রটি নিয়ে বসে। ঠাকুরের গানের সঙ্গে সে সঙ্গৎ করে। সে বলে ঠাকুরের কণ্ঠটি বড়ই মধুর তারের যন্ত্রের সঙ্গে বেশ চলে। ঠাকুর এখন ভাবে মত্ত হয়ে যান। তার নিজের কণ্ঠে যে কত মধু আছে, এতদিন তিনি সেটি জানিতেন না। নতুন সঙ্গীটির গুণে তার একটা নতুন ভাবের স্ফুরণ হয়েছে। তিনি কথাগুলি আর বেসুরে বেতালায় বলতে পারেন না। এসরাজের সুরে সব সময় তাঁর কণ্ঠের সংযত ধ্বনি যেন মাধুর্য্যের অনুসন্ধান করেই চলে, আর প্রতিটি কথা যেন ছন্দোবদ্ধ হয়েই শব্দিত হয়। সমজদার শ্রোতারা বলেন, ঠাকুর আপনার কণ্ঠে মধুর ধারা ঝরে যায়, এত মধু আপনি কোথায় পেলেন? ধন্য আপনার শিক্ষা

গুরু। অনেক দিন ধরে একই ধরনের ধরা বাঁধা নিয়মের গান গুলো মাঝে মাঝে একটু আধটু অদলবদল করে ঠাকুর গান করেন! মাঝে মাঝে নতুন গানও তিনি তৈরী করে শুনিয়ে দেন। ঠাকুরের এখন এমন একটা শক্তি হয়েছে যে, কথা বলতে বলতে সুর ধরলেন—আর সঙ্গে সঙ্গে পদ যোজনা। সুন্দর একটি গান হয়ে গেল। এভাবে প্রতিদিন তিন চারটি করে গান রচনা হয়। অনেক গান তৈরী হয়ে গেছে। এখন গানের বই আর খুঁজতে হয় না। ঠাকুর কথা বলে গেলেই গান হয়ে যায়। আর সেই গান গুলোর কি মিষ্টি সুর। এই সে দিন তিনি গান ধরলেন—

(গান)

ভগবান ফিরেন ভক্তের পাছে ॥
ভক্তের ভগবান বিশ্বময়।
ভক্ত জীবনে ভগবান হয়
প্রেম ভক্তি ধনে বাঁধা
বিশ্বেশ্বর তাঁর ভক্তের কাছে ॥
সাক্ষী আছে পুরাণ ভাগবত
বেদ তন্ত্র মহাভারত
শুক নারদ প্রহ্লাদ ভরত
জন্মে জন্মে হরি-স্মৃতি আছে ॥

দীর্ঘ দিন আমাদের ঠাকুরের কথকতা আর গান শুনছি। কখনো দেখিনি যে তাঁর কথার মাঝে কেহ বাধা দেয়। এই সেদিন রাজেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে মাত্র তিন দিনের কথকতা। গ্রামের

জমিদার রাজেন রায়। তাঁর ছোট ছেলের অন্নপ্রাশন। সেই উপলক্ষ্যে আমাদের ঠাকুরের কথকতা। রাজেন বাবুর আত্মীয় স্বজন বহু গোষ্ঠী! তারা সব দূর গ্রাম থেকে এসেছেন। অনেক দিন বাদে তাঁর গুরু ঠাকুর এসেছেন। ইনি একজন ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতলোক বেশ সুদর্শন কিন্তু হলে হবে কি? আমাদের ঠাকুরের চাল চলন, তাঁর প্রতি লোকের শ্রদ্ধা, আর তাঁর পাওনা প্রভৃতি দেখে কি জানি কেন এক বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠেছে। তাঁর মনে সেই ভাবটি এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, তিনি ডেকে ডেকে একে তাকে কথকতা সম্বন্ধে নানা দোষের উল্লেখ করে দোষারোপ করতে শুরু করেছেন। মাত্র একটি দিন কথকতা শুনেই তিনি তাঁর বিজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায় গ্রামের বহু লোকের মধ্যে একটা ভাবান্তর উপস্থিত হল। কেউ বলে—আজকে রাজন বাবুর বাড়ী যাওয়া হবে না, হয়তো সভার মাঝেই একটা গোলমাল সৃষ্টি করবেন, তাদের গুরু ঠাকুর। কেউ বলে—চলনা দেখেই আসি, আমাদের এমন কথক ঠাকুরকে জব্দ করে কার সাধ্য। আমরাও কি একটা কথার উত্তর করতে পারবো না? গ্রামের লোকেরা পরস্পর প্রশ্ন করে, যুক্তি করে, সন্দেহ করে, আবার পরামর্শ করে, তাদের ঠাকুরকে কেমন করে এই বিপদে রক্ষা করা যায়।

সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বলছে। ধূপ গন্ধে আমোদিত সভামণ্ডল। উল্লখিত শ্রোতৃবৃন্দের মুহুর্মুহু হর্ষ ধ্বনি। কথক ঠাকুর এসে আসনে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বেজে উঠল। পুষ্পবর্ষণ হতে লাগল। ঠাকুরের অনুগমন করছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য বর্গ। তারা একে

একে কাছে কাছে বসে পড়ল। কয়েকটি মহিলা খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারের, এরা সেদিন ঠাকুরের উপদেশ পাবার আশায় এসেছিলেন। ঠাকুর তাদের কথা শুনে যাবার জন্য সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। ইঙ্গিত ক'রে ঠাকুব তাঁর এক পুরাতন শিষ্যাকে এদের যত্ন করবার জন্য বলে দিলেন। ঠাকুরের সঙ্কেতে সেই শিষ্যাটি নিজে আসন থেকে উঠে সেই ভদ্রমহিলাদের বসবার স্থান করে দিলেন। ধন্য এদের গুরুভক্তি! ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে হাসিমুখে ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে তারা বসলেন কথা শুনতে।

ওদিকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টার বাবু এসেছেন। রাজেনবাবু যে গ্রামের বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী। হেড্ পণ্ডিত মহাশয় হরিসভা, কীর্ত্তন, কথকতা, এসব কোনদিন পছন্দ করেন না। তিনি বলেন এসব হট্টগোলে দেশটা উচ্ছন্নে গেল। নাই শাস্ত্রচর্চ্চা, অধ্যাপনা, শুধু আছে খোল আর করতাল, আর কোথায় কথকতা আর গান, ছুটল গ্রাম শুদ্ধ লোক সেই দিকে। ব্রাহ্মণীকে কত বুঝিয়ে বলি বসো আমার কাছে। আমি তোমাকে রঘুবংশ থেকে রামের কথা—তাঁর চৌদ্দ পুরুষের কথা শুনিয়ে দিতেছি। তা সে তো আমার কথা শুনবে না যাবে কোথায় কোন অজানা অজ্ঞাত-কুলশীল কথক এলেন তার কথা শুন্‌তে। আমি আর কোনমতে তাকে বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারিনে। শেষ পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে বলে দিয়েছি, যাও, তোমার যা খুশী তাই কর। যেখানে খুশী যাও, তবে আমার খাওয়ার ব্যবস্থাটা করে বিছানাটা ঠিক করে রেখে বাড়ীর বাইরে যেও। এই পণ্ডিত মহাশয়ও আজ এসেছেন।

কথকতা বেশ জমে উঠেছে। চারিদিক হইতে 'বাহবা সাধু

সাধু' আর 'ধন্য ধন্য' ধ্বনি শুনা যাইতেছে। হঠাৎ ভাগবতের শ্লোক উচ্চারণে কি একটা ছোট খাট দোষ ধরে হেড্ পণ্ডিত মহাশয় মাথা নেড়ে বলে উঠলেন—আহা হা হল না, হল না, ছন্দটা যে ভঙ্গ হয়ে গেল। ভাল করে দেখুন, ওখানটায় আর কিছু হবে? কথকঠাকুরের ছন্দ জ্ঞান না থাক্লে কি আর ভাগবত পড়া যায়।

আরে এ যে অতি সুন্দর এক মহাকাব্য ছন্দটা দেখে তবে তো পাঠ করা চলবে।......

আমাদের কথকঠাকুর এতটুকু বিচলিত হলেন না হেড্ পণ্ডিতের কথা শুনে। তিনি মৃদু হেসে বলেন—পণ্ডিত মশায়ের কথাটা নিয়ে এখন যদি নতুন করে ছন্দবিষয়ে আলোচনা করিতে 'হয় তবে যে প্রসঙ্গটি হচ্চে সেটি বাধা পাবে। আপনাদের অনুমতি হলে আমি ঐ কথা নিয়ে এখন আর কিছু বলবো না কথার শেষে প্রয়োজন মত আলোচনা করব। কথা শুনে হেড্ পণ্ডিত চটে গেলেন। তিনি একটা উচ্চ স্বরে হুঁ বলে উঠে পড়লেন আসন ছেড়ে। আর বিড়্ বিড়্ করে কি বলে বলে চলে গেলেন একা!!

(৬)

কথক ঠাকুর আজ ভরতের কথা বলছেন।—ভরতস্তু মহাভাগবতো যদা ভগবতাবনিতল পরিপালনায় সঞ্চিন্তিতস্তদনুশাসনপরঃ পঞ্চজনীং বিশ্বরূপদুহিতরমুপযেমে— (৫।৭।১)

পরমকৃপালু শ্রীভগবানের কৃপায় রাজর্ষিনাভির পুত্র ঋষভদেবের অবতারপ্রসঙ্গ বর্ণনাপূর্ব্বক শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিতের সমীপে পরমাবেশে রাজর্ষিভরতের কথা আরম্ভ করছেন। ঋষভদেবের পর তিনি হলেন রাজা। আর তাঁরই নামে আমাদের এই দেশ

ভারতবর্ষ। বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীকে ভরত বিবাহ করেন। পঞ্চজনীর পাঁচটি পুত্র। তাদের নাম ভাগবত বলছেন,—(১) সুমতি (২) রাষ্ট্রভৃৎ (৩) সুদর্শন (৪) আববণ (৫) ধূম্রকেতু। এই ভারতের পূর্ব্বনাম ছিল অজনাভ। ভরতের সময় হইতে নাম হইল ভারত।

অজনাভং নামৈতদ্বর্ষং ভারতমিতি যত আরভ্য ব্যপদিশন্তি।

ভরত ছিলেন বহুবিদ্যায় বিশারদ। পিতা ও পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অর্থাৎ ঋষভদেব নাভি প্রিয়ব্রত প্রভৃতির আদর্শ অনুযায়ী খুব ভাল ভাবে উদার পিতৃস্নেহে প্রজাপালন করেছেন। তাঁহার কোনো ভেদ বুদ্ধি ছিল না।

ঈজে চ ভগবন্তং যজ্ঞক্রতুরূপং ক্রতুভিরুচ্চাবচৈঃ।

যজ্ঞেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে তিনি ছোট বড় নানারকম যজ্ঞ করে তাঁহার আরাধনা করেছেন। সে কতরকম যজ্ঞ। সে সকল যজ্ঞের নামও লোকে ভুলে গেছে।

অগ্নিহোত্র, দর্শ পূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, পশুযাগ, সোমযাগ, তাদের প্রকৃতি ও বিকৃতি, মূল ও শাখা ভেদে নানা রকম যজ্ঞ, সে সব কথা পূর্ব্ব মীমাংসা কর্মকাণ্ডে খুব বেশী করে বলা আছে, সেই সব যাগ বুঝি একটাও বাদ পড়েনি। খুব আগ্রহ,—অনেক উপচাব, বিচিত্র বিধান, অভিনব অনুষ্ঠান, অপূর্ব্ব ফল। এই সকল যজ্ঞের মধ্যে ভরতের ভাবনার ছিল বিচিত্র প্রবন্ধ। যজ্ঞ নানা রকম, তাহাদের অঙ্গ এবং ক্রিয়াব বহু বিচিত্রতা। ফলও প্রত্যেক কর্ম্মের পৃথক। ক্রিয়ার ফল ধর্ম অপূর্ব্ব। ভরত জানিতেন, পরম ব্রহ্ম যজ্ঞপুরুষ, তিনি সমস্ত দেবতার সমষ্টিরূপ। তিনিই সমস্ত মন্ত্রের প্রতিপাদ্য

বেদের যত মন্ত্র সকলেই সেই পরমব্রহ্ম যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকেই প্রতিপাদন করে। সকল বেদের তাৎপর্য্য নিয়ামক ভগবান বাসুদেবে। যত যত দেবতার নাম করে পুরোহিতেরা আহুতি প্রদান করেন, সে যেরূপ যজ্ঞেই হউক, না কেন, সেই ভগবান বাসুদেবের তৃপ্তির জন্যই। অন্য সকল দেবতা সেই পরম দেবতা বাসুদেবেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। যে দেবতারই পূজা হউক স্বতন্ত্র কেহ নয়, সকলেই সেই বাসুদেবের অবয়ব।

দেবাংস্তান্ পুরুষাবয়বেষু অভ্যধ্যায়ৎ।

এই ভাবে কর্ম অনুষ্ঠানে রাজার সমস্ত কর্ম্ম বিশুদ্ধ হয়েছিল। কর্মশুদ্ধ না হলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না। যিনি যে ভাবের কর্ম করেন সঙ্গে সঙ্গে তার কিছুটা জড়িয়ে পড়তে হয়। এইজন্য বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে কর্মের নিয়ম বেঁধে দেয়া হয়েছিল। আমরা যখন থেকে সেই নিয়মকে লঙ্ঘন করতে শুরু করেছি। তখন থেকে আমাদের মনের উপরেও বিচিত্র প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। তাই দেখি এক বর্ণের লোক অপরের কর্ম্ম ক'রে মনকেও সেই কর্ম্মের অনুরূপ ক'রে ফেল্ছে দিনের পর দিন। এই ভাবে শুদ্ধ চিত্ততা, বিমল দৃষ্টি, উদারপ্রাণতার আর পরিচয় পাওয়া যায় না। যাক্ অবান্তর কথায় প্রয়োজন নেই। রাজর্ষি ভরত শুদ্ধ কর্মের গুণে শুদ্ধ বুদ্ধি ও মন লাভ করেছিলেন। তিনি অন্তরাকাশে ভগবান বাসুদেবকে—ভগবানকে ভাবনা করেন। সেই পরম পুরুষের গলে কৌস্তুভ মণি, অপূর্ব্ব তার প্রভা, বিচিত্র দীপ্তি। বুকের দক্ষিণ দিকে শুভ্র রোমাবলী আবর্ত্তরূপে বিরাজমান উহাকে বলে শ্রীবৎস চিহ্ন। এই চিহ্ন পরম পুরুষোত্তম ভিন্ন কোনো

জীবের মধ্যে পরিদৃশ্যমান হয় না। এই সকল বিশিষ্ট চিহ্ন ভাবনায় পরমানন্দময়ের রূপ পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়া উঠে। ইহাছাড়া আছে বনমালা চরণ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভিত চতুর্ব্বাহু। ভগবান বাসুদেবের ভাবনায় রাজার ভক্তি ক্রমশঃ গাঢ়তর হয়েছিল। হবেই বা না কেন? যে যার ভাবনা করে সে তাঁর স্বরূপতা লাভ করে, এ কথা যোগ শাস্ত্র উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছে।

ভগবান গীতাতেও ঐরূপ কথা বলেছেন, আমাকে ভাবিলে আমাকেই লাভ করে। বহু দিন ধরে ভরতের এই ভগবদ্-ভাবনায় সাধনা চলেছিল। আমরা কিন্তু দু'দশদিন ঈশ্বর ভাবনা করেই তাঁহার দর্শনের জন্য স্পর্দ্ধা করি। ধৈর্য্য আমাদের মোটে নেই। ভগবদারাধনায় সেই ধৈর্য্যই হল সব চাইতে প্রধান উপকরণ। ভাগবত বলেন "এবং বর্ষাযুত সহস্র পর্য্যন্ত অর্থাৎ অযুত হাজার বৎসর ভরত ভগবানে নিষ্ঠার সহিত রাজত্ব করেছেন ধৈর্য্য ধারণ করে এবং ভগবৎ প্রাপ্তির লালসা হৃদয়ে পোষণ করেছেন। রাজ্য ভোগের পর নিজের সেই পাঁচটি পুত্র সুমতি রাষ্ট্রভৃৎ সুদর্শন প্রভৃতির উপর রাজ্যের সমস্ত ভার সমর্পণ করে তিনি গৃহ ছেড়ে চলিলেন মহাপ্রস্থানের পথে। আগেকার দিনে ভারতীয় সংস্কৃতির একটা প্রধান লাভ ছিল জীবনের কর্মাবসানে অবসর গ্রহণ করা, অনিকেতন হয়ে মহাপ্রস্থানের পথে ভ্রমণ করা, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা পরিব্রাজক হওয়া বা সন্ন্যাস লওয়া। লোভের বশে ভয়ে কাতর আমাদের অনির্দ্দিষ্ট ভাগ্যকে বরণ করে লওয়ার সাহস নাই। তাই দুর্ব্বল চিত্ত আমরা মৃত্যুর শেষ দিনটি অপেক্ষা

করে কর্মহীন আদর হীন প্রয়োজনহীন হলেও বসে থাকি নিশ্চিন্ত গৃহের বেষ্টনীর মধ্যে—শত সহস্র অপমানের বাণে বিদ্ধ হবার জন্য। "বিচিত্ররোগের" পসরা বহন করে সকলের ঘৃণার পাত্র হয়ে জীবনের অবশিষ্ট অংশ যাপন করবার জন্য আমরা থাকি। যাক্ সে কথা রাজা ভরত চল্‌লেন পুলহ আশ্রমে। মরীচি—অত্রি—অঙ্গিরা—পুলহ—পুলস্ত্য, এঁরা সপ্তর্ষি গণনায় প্রসিদ্ধ মুনি।

সেই সপ্তর্ষির অন্যতম পুলহের আশ্রম অতিশয় মনোরম। এই আশ্রমের মহিমা অনেক। ভাগবত বলেন—যত্র হ বাব ভগবান্ হরিরদ্যাপি তত্রত্যানাং। নিজজনানাং বাৎসল্যেন সন্নিধ্যাপয়তে ইচ্ছারূপেন্। অর্থাৎ সেখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা বড় ভাগ্যবান্ তাঁরা ভগবানের নিজজন। তাঁদের প্রতি ভগবানের অসীম করুণা বাৎসল্য। তাঁরা যদি সাক্ষাৎ ভাবে পরম পুরুষ শ্রীভগবানকে কখনো দেখ্‌তে ইচ্ছা করেন সেই ইচ্ছামাত্র ভগবান শ্রীহরি আজও পর্য্যন্ত সেখানকার ভক্তদের সাক্ষাৎদর্শন দানক'রে কৃতার্থ করেন।

যত্রাশ্রমপদান্যু ভয়তো নাভিভি দৃশচ্ছক্রৈ—
শ্চক্রনদী নাম সরিৎপ্রবরা সর্বতঃ পবিত্রীকরোতি॥

এই আশ্রম স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। দুই পার্শ্বদিয়ে গণ্ডকী নদী প্রবাহিতা। মনে হয় আশ্রমটি একটি দ্বীপ। দুদিক দিয়েই সেই পরম পবিত্র চক্রবহা নদী। শালগ্রাম শিলা এই স্রোতের সঙ্গে গড়িয়ে যায়। সর্ব্বদাই একটানা শব্দ যেন সেই আশ্রমের মহিমা গান করে। নদীর জল পরম পবিত্র। ধারে ধারে সজীব বৃক্ষ পল্লব মণ্ডিত বনপ্রদেশ। মুনি ঋষিদের পুষ্প

পত্র আহরণের জন্য খুব বেশী দূরে আর যেতে হয় না। অনায়াসে তাঁরা নিত্য ক্রিয়ার উপাচার সংগ্রহ করেন এই বন হতে।

স্বভাবজাত তুলসীকানন--পদ্মবন—বিচিত্র ফলমূলের বৃক্ষ অযত্ন বর্দ্ধিত। ভরত একা এই আশ্রমের এক প্রান্তে অবস্থান করেন। তাঁর দ্বিতীয় সঙ্গী কেহ নাই। ছিল তাঁর আত্মীয় বান্ধব স্ত্রী পুত্র সবই। এখন তিনি নিঃসঙ্গ জীবনের আনন্দ লালসায় আকৃষ্ট। নির্জ্জন আশ্রমে আপন মনে রাজা জল ফল মূল নিত্য সংগ্রহ করে আনেন খুশীমত। মনের আগ্রহে পরম পুরুষোত্তমের আরাধনা করেন তিনি একাকী একমনে। কোনো বাঁধা নেই প্রতিবন্ধক নেই। কোনো উপদ্রব নেই, নেই চঞ্চলতা অন্যাবেশ তন্দ্রা বা চিত্তের কোনো দৌবাত্ম্য। সম্যক্ ভোগের পর এই ত্যাগের জীবন তার হয়েছে ছন্দোবদ্ধ দিনের পর দিন তার বেড়ে যায় আগ্রহ। কোনো সময় নেই কোনোরূপ শৈথিল্য, সদা জাগ্রত মন নিয়ে তিনি অগ্রসর হলেন আরাধনার সুখময় সরল সাহজিক পথে। আপনারা শুনেছেন—আদৌশ্রদ্ধা ততো সাধু সঙ্গঃ অথ ভজন ক্রিয়া ততো অনর্থ নিবৃত্তিঃ। রাজার শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গ ভজন ক্রিয়া পূর্ণরূপেই প্রকাশ হয়েছে—ভজনের ফলে ক্রমশঃ তাঁর লৌকিক অনর্থ সংসারাসক্তিও দূরীভূত হয়ে গেছে—দীর্ঘকাল একনিষ্ঠ ভাবে ভগবদারাধনার ফলে নিষ্ঠার সহিত রাজা ভজন করেন।

রুচিও তাঁর হয়েছে। ভজন ভিন্ন তাঁর আর কিছু ভাল লাগেনা, আসক্তির অভ্যুদয়ে সর্ব্বতোভাবে রাজা ভরত বাসুদেব নিষ্ঠায় সমর্পিত-আত্মা প্রেমের প্রাচুর্য্যে অনুরাগে অভিরঞ্জিতমন

রাজা; নিত্য নব চমৎকারিতা তাঁর উপলব্ধি হয় ভগবৎসম্বন্ধে। অনুরাগের ফল এই—বস্তুর মাধুর্য্য প্রতি পদে নব নব রূপে অনুভূত হওয়া। তিলে তিলে নৌতুন হোয়। এই রকম ভাব রাজার আরাধনায়। কি সুখ তিনি পেয়েছেন বাসুদেব ভাবনায়। এই আনন্দের প্রাচুর্য্যে তার চিত্ত হয়ে গেছে একেবারে বিগলিত। এমন সুখের উচ্ছ্বাস, এমন প্রেম-প্রবাহের তীব্রতা এমন অন্তরের ভাব গম্ভীরতা, এমন প্রাণের গতি যে, থেকে থেকে তাঁর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠে, শুধু কি কেঁপে উঠা, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, শিউরে ওঠেন তিনি—কে যেন তার প্রাণে দোলা দিয়ে যায়। তাঁকে বিহ্বল করে ফেলে। তিনি হয়ে যান আত্মহারা। কখনো কখনো তিনি চোখ চেয়ে দেখ্‌তে চান কিন্তু তাঁর চোখ ভরে ওঠে জলে—কোথা থেকে অত জল আসে চোখে তা তিনি বুঝে উঠতে পারেন না একটুও। চেষ্টা করেন জল বন্ধ কর্ত্তে আরো বেশী করে আসে রুদ্ধ গতি স্রোত-বেগের মত বাধাহীন ছন্দে।

তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কেন এমন হয়, তিনি বলতে পারেন না কেন। শুকমুনি বলেন—তাঁর মনের ভাবটি এই ভাবে "এবং নিজরমণারুণ চরণারবিন্দানুধ্যান পরিচিতভক্তিযোগেন পরিপ্লুতপরমাহ্লাদ গম্ভীর হৃদয় হ্রদাবগাঢ় ধিষণস্তামপি ক্রিয়মাণাং ভগবৎসপর্য্যাং ন সস্মার।" ভাব পূর্ণ অন্তরে নিজের নয়ন মন অভিরাম অরুণ কমল বিনিন্দি চরণারবিন্দ সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান বাসুদেবের শোভা সন্দর্শনে রাজা এমন ভাবে আত্মহারা যে ভগবানের নিয়মিত সেবাকার্য্য পর্য্যন্ত হইয়া উঠে না। তিনি মুগ্ধের মত দিন যাপন করেন। তিনি যেন কেমন এক রকম হয়ে গেছেন।

রাজা ব্রতধারী, নিয়মিত ব্রত পালন করেন। প্রতিদিন নিয়মিত স্নান তর্পণ উপাসনা তাঁকে করতে হয়। স্নান করে গণ্ডকী নদীর পবিত্র জলে অভিষিক্ত শরীর কুঞ্চিত কেশ কলাপও জলসিক্ত সেদিকে লক্ষ্য নেই রাজার। তিনি সূর্য্যমণ্ডলে হিরণ্ময় বপু পরম পুরুষের আরাধনা করেন সূর্যমুখী হয়ে।

ব্রাহ্মণেরা বৈদিক সন্ধ্যার সময়ে সূর্য্যোপস্থান করেন। এটি আমাদের প্রাচীনতম যুগের সূর্যোপাসনার ক্রম বিশেষ। ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে সূর্য্যোপাসনা যে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত ছিল তা আর বলে দিতে হবেনা নিশ্চয়।

বৈদিক সন্ধ্যা উপনীত ত্রিবর্ণেরই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিনেরই এই সূর্য্যোপাসনার অংশটির উপর পরম্পরা প্রাপ্ত অধিকার আছে। কিন্তু এখন আমরা উহা অনেকাংশে নিরর্থক মনে করে অবলীলা ক্রমে ত্যাগ করেছি। সূর্য্যোপস্থান বা কিছুক্ষণ সূর্য্যের মুখোমুখী থাকা যে আমাদের শরীর চর্চ্চাবিদ্‌গণও সমর্থন করবেন এতে সন্দেহ নেই। উপাসনা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। এখনো শৈব, শাক্ত বা বৈষ্ণব সাধক, তিনি যে বর্ণেরই হউন, যখন তাঁর ইষ্টদেবকে স্মরণ করে সন্ধ্যা করবেন তাঁকে সূর্য্য মণ্ডলের মধ্যেই ইষ্ট দেবকে স্মরণ করতে হবে এই বিধান প্রবর্ত্তিত রয়েছে। তাহলেই বুঝুন, এই সূর্য্যোপস্থান কেমন গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। যাহ'ক রাজা সূর্য্যোপস্থান প্রসঙ্গে যে মন্ত্রটি বলতেন সেটি ভাগবত বলেন—

পরোরজঃ সবিতুর্জাত বেদো দেবস্য ভর্গো মনসেদং জজান।
সুরেতসাদঃ পুনরাবিশ্য চষ্টে হংসং গৃধ্রাণাং নৃষদ্রিঙ্গিরামিমঃ

এই মন্ত্রের অর্থটি একটু আলোচনা করা যাক্। সোজাসুজি এর অর্থ হল ঃ—

দেবস্য সবিতুঃ অর্থাৎ সবিতা দেবতার। গায়ত্রীর মধ্যে এই সবিতার কথা আছে। তিনি বিশ্বস্রষ্টা তিনি দেব অর্থাৎ ক্রীড়াশীল বিশ্বরচনা তাঁর খেলা।
জগৎ প্রকাশ সেই প্রধান খেলা। তাঁর ভর্গঃ অর্থাৎ তেজ।

এই ভর্গ কথাটিও গায়ত্রীব কথা। এই তেজ এই আলো সে যে কি অনির্ব্বচনীয় তা অধ্যাত্মবাদী গণই জানেন। লৌকিক জগতে সেই জ্যোতির আভাস আলোক উৎসব "বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার 'মেরু প্রদেশে অরোরা।" অপূর্ব্ব প্রভা—অনন্ত দীপ্তি—উচ্ছলিত আলোক, সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারকা আলোকময়, যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। তাঁর আলোকে জগৎ আলো। সেই অব্যক্ত আনন্দময়ের আনন্দ আলোক উপনিষদে ভর্গঃ শব্দের বাচ্য। সেই আলোকের—সেই জ্ঞানের—সেই প্রকাশের—সেই আনন্দের শরণ লই। গায়ত্রীর তাৎপর্য্য ভাগবত। এই শ্লোকে ভরতের সূর্য্যোপস্থানে সেই কথা সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

এই ভর্গঃ প্রাকৃত নয়, অপ্রাকৃত। তাই শ্লোকে পরোরজঃ কথাটি রয়েছে। পরোরজঃ অর্থাৎ রজসঃ উপলক্ষণাৎ সত্ত্ব রজঃ তমোময় প্রকৃতেঃ পরং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং অপ্রাকৃতমিতি।

জাতবেদ কথায় বুঝিতে হইবে সমস্ত জগতের জীবগণের গতি ভক্তগণের অভীষ্ট সিদ্ধি যাহা হইতে হয়, এমন যে স্বরূপভূত পরমেশ্বর মহিমা। যাঁর মনসা অর্থাৎ মনের সঙ্কল্প মাত্র ইদং বিশ্বং এই জগৎ জচান সমস্ত সৃষ্টি করেছেন।

সোঽকাময়ত একোঽহং বহুস্যাম্, এই সঙ্কল্প পূর্ব্বিকা সৃষ্টি যাঁর অনায়াসসাধ্য। সৃষ্টি প্রক্রিয়া প্রধানতঃ দুই প্রকার। প্রথমতঃ সঙ্কল্প সৃষ্টি আর দ্বিতীয়তঃ মৈথুন সৃষ্টি। সঙ্কল্প সৃষ্টি সেই পরম পুরুষের ইচ্ছায় অনায়াসে সৃষ্টি, আর স্ত্রী পুরুষের দেহ সম্বন্ধে সৃষ্টি মৈথুন সৃষ্টি জীবের সম্বন্ধে।

শুধু সৃষ্টিতেই সেই পরমদেবতার কার্য্য পূর্ণ হয়নি। সৃষ্ট জগতে তিনি অন্তর্য্যামী রূপে প্রবেশ করেছেন। তাই বলেন, পুনঃ অদঃ আবার সেই সবিতা এই সৃষ্ট জগতে আবিশ্য অন্তর্য্যামীরূপে প্রবেশ ক'রে—স্বরেতসা অর্থাৎ নিজের চিৎ শক্তি দ্বারা তিনি কি করেন—না, গৃধ্রানম্ (আকাঙ্ক্ষাবান্) হংসং (জীবকে) চষ্টে (দেখেন), পালন করেন, পোষণ করেন। তিনিই জনক স্রষ্টা—তিনিই পালন-কারিণী পোষণ কারিণী মাতা। ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব। শুধু এই পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব নয়, তিনিই আবার গতিদাতা। সেই কথাটি বলেন—নৃষদ্রিঙ্গিবাম্ এই ভাষায়। ইহার অর্থ নৃষু সীদতি উপাধিতয়া তিষ্ঠতি নৃষদ্ বুদ্ধিঃ সেই বুদ্ধির রিঙ্গিং রিঙ্গনং গতিঃ অর্থাৎ দোলা দিয়ে যথা নির্দ্দিষ্ট দিকে পরিচালিত ক'রে সার্থকতা প্রদান ক'রে রাতি দদাতি যে, সেই পরম দেবতার আনন্দ আলোকের শরণ গ্রহণ করি।

তিনি যে বুদ্ধির প্রেরক তিনি যে গীতার 'গতি র্ভর্ত্তাপ্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন। আমরা সেই বাসুদেবের শরণ গ্রহণ করি, যিনি নিজে মুখেই নিজের কথা বলেছেন।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব-চ।
গতি র্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।

গীতা (৯।১৭।১৮)

বেদের সার উপাসনা-রহস্য গায়ত্রী মন্ত্রে বলা হয়েছে। ভারতের সাধনা এই গায়ত্রী মূলক। সবিতা প্রসবিতা বিশ্ব প্রকাশক জগতের পিতা মাতা প্রভু সাক্ষী তিনিই যিনি গায়ত্রীতে পরম দেবতা বলে নির্ণীত। গীতায় সেই পুরুষোত্তম বিশ্বের কারণ এবং সকলের বান্ধব সুহৃৎ বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। রাজর্ষি ভরতের সাধনায় সূর্য্যমণ্ডলে সেই সর্ব্বজীবের গতি এবং বুদ্ধির প্রকাশক আনন্দ আলোকের মুখ্য উৎসস্বরূপ বাসুদেবের আরাধনা-ক্রমের উদ্দেশ করা হয়েছে।

গায়ত্রী মন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র, দেবতা সবিতা এবং ছন্দ গায়ত্রী। সবিতা দেবতা বলে এই মন্ত্রকে সাবিত্রীও বলা হয়। চব্বিশঅক্ষর হওয়াই গায়ত্রী ছন্দের নিয়ম কিন্তু এই মন্ত্রে একটি অক্ষর কম আছে বলিয়া পিঙ্গল ছন্দ সূত্র অনুসারে ইহাকে নিছদ্ গায়ত্রী বলা হইয়াছে। বরেণ্যম্ কথাটিকে বরেনিয়ম্ এইরূপ পাঠ করিয়া পণ্ডিতেরা চব্বিশ অক্ষর পূরণ করিয়া লন ইহাও দেখা যায়।

কাহারও কাহারও মতে এই গায়ত্রীর অধিষ্ঠাত্রীদেবতা দশভূজা ও পঞ্চমুখী এবং সকল প্রকার কামনা পূর্ণকারিণী। কথিত আছে গায়ত্রীর মহামহিমা দর্শন করিয়া বাল্মীকি মুনি এই চব্বিশ অক্ষরের

প্রতিটি অক্ষরের প্রতীক সহস্র শ্লোক রচনা করেন। তাহাতেই রামায়ণের চব্বিশ সহস্র শ্লোক বিরচিত হইয়াছে।

মনু সংহিতার বর্ণনা শুনুন—

যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাস্ত্রীণিবর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।

স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূ্র্তঃ স্বমূর্ত্তিমান্। ২।৮২

যিনি তিন বৎসর নিয়মিত ভাবে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন, তাহার পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয়। প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী-জপের নিয়ম চিরকাল প্রচলিত আছে। প্রণবের তাৎপর্য্য পরম-রক্ষক, পরমব্রহ্ম, ভূঃ ভূবঃ স্বঃ শুধু তিন লোককেই বুঝায় না, ইহা ভিন্ন সেই পরমব্রহ্ম পুরুষোত্তমের মহাবিভূতি সৎ, চিৎ ও আনন্দ শক্তিকেও বুঝায়।

এইভাবে সচ্চিদানন্দময় পরমপুরুষোত্তম নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা রক্ষক ও সংহারকরূপে সাধকের আরাধ্য গায়ত্রীর দেবতা। লৌকিক বিষয়ে বিমুগ্ধতা পরমেশ্বর-বিমুখতার বিস্তার করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে মরণবিভীষিকা- মানুষকে ক্ষণভঙ্গুর সুখেও অতৃপ্ত ও উন্মাদ করিয়া তুলিতেছে। যাহারা এই বিপদের মুখে আত্ম-রক্ষার নিমিত্ত ইচ্ছুক, তাহারা অবশ্যই স্ব স্ব গুরুদেবের নিকট উপদিষ্ট গারত্রীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া জপ সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন। জীবনের সাধনাই শক্তি, সাধনাই বল, এই সাধনা ভিন্ন জীবনের কোনো মূল্য নাই। বহু অর্থ বহু মান পাইয়াও সে যদি সাধনার অমৃত হইতে বঞ্চিত থাকে তাহাকে একান্ত ভাবেই বঞ্চিত বলিতে হইবে। পরমেশ্বর অভিমুখতাই মানবজীবনে প্রাপ্তি আর পরমেশ্বর-বিমুখতাই জীবনে শ্রেষ্ঠ বঞ্চনা।……

রাজর্ষি ভরত একমনা হইয়া গায়ত্রী মন্ত্রের উপাসনা করিতেছিলেন। হঠাৎ দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইল। অদূরে সিংহের গর্জ্জন শ্রুতিগোচর হইল। সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধ আশ্রমভূমি প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। অকালে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় সেই গভীর ধ্বনি বনানীকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। কোথা হইতে এক অসহায়া হরিণী প্রাণভয়ে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া রাজার সম্মুখস্থ স্রোতের উপর লাফাইয়া পড়িল। হরিণীর গর্ভস্থ শিশুটি বেগে জলের মধ্যে পড়িয়া গেল। হরিণী কোনো গতিকে স্রোতের অপর পারে উৎপতিত হইল বটে, কিন্তু তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। সদ্যঃপ্রসূত সেই শিশুহরিণটি জলে ভাসিয়া যায়, রাজা স্থির থাকিতে পারিলেন না। আর কে-ই বা চক্ষের সম্মুখে ঐরূপ ঘটনা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে? তিনি ধ্যান ছাড়িয়া শিশুটিকে রক্ষা করিবার জন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। স্রোতোবেগ হইতে দ্রুতগতিতে হরিণশিশুটিকে তুলিয়া লইয়া আসিলেন, মৃতপ্রায় মাতৃহারা হরিণশাবকের প্রতি তাহার করুণার উদ্রেকও হইল। তিনি উহাকে নানাভাবে যত্ন করিতে লাগিলেন। তাহার যত্নে কোনো রকমে হরিণশিশুটি প্রাণ পাইল। আশ্রমে সাধু রাজা উহাকে আপন শিশুর মতই পালন করেন। দিনের মত দিন যায়, এই হরিণশাবকের পোষণ পালনে। রাজার ধ্যান টুটিল, জপ ভাঙ্গিল, মন অস্থির হইল, শুচিতা গেল, ব্রতভঙ্গ হইল, অসঙ্গজীবনে সঙ্গী হইল হরিণশিশু। ······ভরত যেখানে যখন যান সঙ্গে সেই হরিণশিশু। সর্ব্বদা ভয় কখন কোন হিংস্র-পশু তাহার প্রিয় হরিণশিশুটিকে মারিয়া ফেলে। সবখানি চিন্তা

তার উপর পড়ল ভরতের। আকাশে বাতাসে ভূমিতে জলে সর্ব্বত্র সেই হরিণশিশু ভরতের হৃদয়াবেগে ছড়িয়ে গেছে। চাঁদের কালো দাগ সে-ও তার হরিণ শিশুর গৌরব। যজ্ঞের ভূমি পবিত্র করে এই হরিণ শিশুর পদস্পর্শ। এমনি কত কিছু ভাবনা আসক্ত-ভরতেব মনে। ক্রমে ভরতের দুবতিক্রমকালঃ করালরভস আপদ্যত। সেই অনতিক্রমণীয় মৃত্যুকাল—যে কালের করালতা সর্ব্বজন সুবিদিত—যাহাব কাছে কাহারও আর রেহাই নেই। সকলকেই যে মৃত্যুর মুখে পড়িতে হয়, সেই মৃত্যুকাল এসে উপস্থিত, তাই তো আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন, মানুষ কি অবুঝ? কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ। কখন কাল আসে কে জানে? তাই আগে থেকেই তৈবী হয়ে থাকাই প্রয়োজন। মৃত্যু যখন আসবে সেতো আর বলে ক'য়ে জানিয়ে আসবে না। ঋতু পরিবর্ত্তনে গাছের ফুল পাতা ঝড়ে পড়ে, কালের চক্র পরিবর্ত্তনে মৃত্যু ঘটে। বাধা দেবার কারুর সাধ্যি নেই। এই তো আপনা-দের ডাক্তার রণদা বাবু। কতবড় প্রতাপ তাঁর। কত লোকের জীবন-মরণের কর্ত্তা বলে একদিন যাকে গাঁয়ের লোকেরা মনে কর্ত্তো। তিনি কতদিন ধরে ডাক্তারী গবেষণা করে কত নতুন তথ্যই না আবিষ্কার করেছেন। তিনি তাঁব সমান বয়সীদের কাছে আশ্চর্য্য খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। লোকে গিয়ে তাঁর কাছে কতবার বলেছে ডাক্তার বাবু আমার ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দিন। এবার যাতে সে রক্ষা পায় তার ব্যবস্থা করুন। কিন্তু সেই ডাক্তার বাবুর যখন কাল এল আর কি কেউ তাঁকে ধরে রাখতে পারলে? পুরো একটা ঘন্টাও তাঁর চিকিৎসার জন্য পাওয়া গেলনা, বল্লেন

বুকটা কেমন কন কন করে উঠেছে—বলাও যা, শুয়ে পড়াও তা, আর সঙ্গে সঙ্গে শেষ-নিদ্রা, সে ঘুম আর ভাঙ্গল না। এই তো মানুষের বড়াই; আর এই তো মানুষের অহঙ্কার। থাক সে কথা।

এখন রাজা ভরতের কথাই বলছি রাজার মৃত্যু সময়ে তাহার ভাবনা হরিণশিশু। যে রাজা রাজ্যপাট ফেলে ঐশ্বর্য্য পুত্র পত্নী বিত্তবৈভব সকলই পরিত্যাগ করে বনে এসে ভজনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাহার কি দুর্দ্দৈব সমুপস্থিত? তাহার মন ধাবিত হয়েছে—সেই মাতৃহারা সযত্নে সংলালিত হরিণশিশুটির প্রতি। রাজা কোনো মতে সেই চিন্তা থেকে মনকে মুক্ত করতে অসমর্থ। নিষ্ঠুর কাল কাহারও অপেক্ষা রাখে না। রাজা সেই ভাবনা-বিধুরতার মধ্যেই অন্তঃশ্বাস ত্যাগ করলেন—তদানীমপি পার্শ্ববর্ত্তি-নমাত্মজমিবানুশোচন্তমভিবীক্ষমানো মৃগ এবাভিনিবেশিতমনা বিসৃজ্য লোকমিমং সহ মৃগেন কলেবরং মৃতমনু ন মৃত জন্মানু স্মৃতিরিতর-বনমৃগশরীরমবাপ।

হায় রাজা। তুমি একদিন ভগবদারাধনা করেও শেষটা একি হল! সাধারণ মানুষ মৃত্যুসময়ে পার্শ্ববর্ত্তী পুত্র কলত্রাদির কান্না-কাটি দেখে তাদের দুঃখের কথা ভাবে নিজের পরমার্থ ভুল করে। আত্মীয়ের চিন্তায় আত্মহারা মানুষ আবার জন্ম গ্রহণ করে তাদের ঋণশোধ করবার জন্য। রাজা তোমারই বা এমন কেন হল? তুমি তো গৃহ পরিত্যাগ করে আত্মীয় স্বজন পুত্র বান্ধব সব দূরে পরিহার করে সাধন ভজনের জন্যই এই তপস্বীর জীবন যাপন করেছিলে। কেন তবে তোমার এই ক্ষুদ্র হরিণশিশুর ভাবনা এত

তীব্র হয়ে উঠল মৃত্যু সময়ে; রাজা কিন্তু সেই ভাবনায় তন্ময় হয়ে দেহ ত্যাগের ফলে সেই হরিণকুলেই জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হল জন্মান্তরে। কথাটা আশ্চর্য্য হলেও মিথ্যা নয়, যার মৃত্যুসময়ে যেমন ভাবনা হয়, তার মৃত্যুর পর সেই রকম দেহ লাভ কর্ত্তে হবে। শাস্ত্র এজন্যই খুব সাবধান হয়ে ধর্ম্মকর্ম্ম করবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। যার সারা জীবন যে অভ্যাস মৃত্যু কালে সেইটেই প্রবল হয়ে উঠবার সম্ভাবনা আছে তাই ভরসা। তাই তো লোকে ব'লে ধর্ম্মকর্ম্ম যেমন তেমন, মরতে জানলে হয়।

একটা পতিতা নারী ছিল বিদর্ভ দেশে। সে জীবনে নানা ভাবেই লাঞ্ছিতা বঞ্চিতা এবং বহু পাপাচরণ করেছে। সেজন্য সে অনুতপ্তও ভীষণ। একদিন সখ করে সে একটা টিয়া পাখী কিনে আনে। আর সেই পাখীটাকে সে প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে 'রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ' এই ভাবে নাম শিক্ষা দেয়। যখন সে নাম শিক্ষা দেয় তখন তাহার একাগ্রতাও খুব বেশী হয়। এমনি করে কিছুদিন অভ্যাস করিয়ে পাখীটাকে সে বোল ধরিয়েছে। এখন পাখীটা তাহাকে দেখামাত্র বলে উঠে 'রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ কও'। সঙ্গে সঙ্গে গণিকাও সেই পরম মঙ্গল রাধাকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করে—এইভাবে কিছুদিন যায়। গণিকার অন্তিমকাল এসে উপস্থিত। সে কিন্তু তার সারা জীবনের পাপের কথা মনে করে বড়ই ছট্‌ফট্ করতে থাকে। এদিকে প্রতিপালিকা গৃহকর্ত্রীর ঐ অবস্থা দেখে পাখীটাও চেঁচিয়ে রাধাকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করে। মৃত্যুকালের ভয় বিহ্বলতার মাঝখানেও পাখীর মুখে সমুচ্চারিত রাধাকৃষ্ণ নাম শুনে ক্ষণেকের মধ্যে সেই বারবনিতার কৃষ্ণ ভাবোদয় হয়, আর সেই সঙ্গে দেহ-

ত্যাগের ফলে তার হল শ্রীকৃষ্ণলোক প্রাপ্তি। পাখীটিও কিন্তু তাহার পালিকার অনুগমন ক'রে জন্মান্তরে এক ভক্তদেহ লাভ করল। সে তখন কীর্ত্তনময় জীবন যাপনের সুযোগ পেয়েছিল।

কথক ঠাকুর কি একটি গান করে সেদিনকার কথকতা শেষ কর্ত্তে যাচ্ছিলেন। গানটি যেটুকু মনে পড়ে বলছি—

ওরে আমার মন—ভাবরে নিত্য নিরঞ্জন
—পাবিরে ভবভয়ভঞ্জন শমনের ভয় রবে নারে।
যত বন্ধু পরিজন—কেহ নহেবে আপন
—চিরদিনের বন্ধু যে জন তার রাঙ্গা চরণ
ভুলো নারে।
শ্রীগুরু করুণাময়—যার ভাবনায় ভবক্ষয়
ও তার কান্তি হের জগন্ময়— মিছে মায়ায় ডুবো নারে॥

গানের সুরে শ্রোতৃমণ্ডলী স্তব্ধপ্রায়। রাতও অনেকটা হয়েছে। সকলেই বাড়ী যাবার জন্য উৎকণ্ঠিত।

হঠাৎ ওপাড়ার চিতুবাবু। তিনি কলেক্টরীতে সরকারের কাজ করেন, বলে উঠলেন—ঠাকুর মশায়! আপনার কথা বেশ লাগছিল কিন্তু আপনি যে আমার এ জীবনটার কর্মফল জন্মান্তরেও টেনে নিয়ে যাচ্ছেন ওটা কিন্তু আমার মোটে ভাল লাগছিল না। দেখুন, এই শরীরে আমরা খেটে খেটে হয়রান হয়ে যাচ্ছি ভাব-ছিলাম মৃত্যুর পর যাক্ সব শেষ হয়ে গেল। একটা বিশ্রামের সুযোগ হল। এ জীবনে যা করলুম সে সব কাজের ফল আবার পুনর্জন্ম নিয়ে ভোগ কর্ত্তে হবে এসব কথা আজকালকার দিনে কি আর চলে? দেখুন চিন্তা করে, বিজ্ঞান যে সব নতুন নতুন

আবিষ্কার করছে। মানুষের প্রাণ দেওয়াটা শুধু বাকী তাছাড়া আর কি বাকী আছে বলুন না। এসব দেখে শুনে জন্মান্তরের কথা কিন্তু আর বিশ্বাস কর্ত্তে মন চায় না। এ সম্বন্ধে আমার খুবই সন্দেহ আছে। আপনাদের পুঁথি পাঁজীতে এ সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে কি? যদি থাকে সেই কথাটাও শুনতে চাই। কথক ঠাকুর তার স্বভাবসুলভ হাসিমুখে গ্রন্থ বাঁধিতে বাঁধিতে বলেন—বেশতো সরকার মশায় যে প্রশ্ন করেছেন আমরা না হয় কদিন সে সম্বন্ধেই একটু আলোচনা কর্ব্বো। এতো খুব ভাল কথাই তিনি বলেছেন। তবে আজ অনেক রাত্রি হয়ে গেল। আজ আর তাঁর উত্তর দেওয়ার সুযোগ হলো না। এজন্য তিনি নিশ্চয় আমাকে ক্ষমা কর্ব্বেন। চিতুবাবু বলেন, আজ্ঞে তা নয়, তা নয়, আপনি ও কি কথা বলছেন? আমি বলছি ঐ কথাটা একটু পরিষ্কার হলে সব্বারই খুব উপকার হয়। তা যখন আপনার সুযোগ হবে ঐ কথাটা একটু বুঝিয়ে বল্লেই হবে। আমার কথা হচ্ছে কিনা আপনার কথাটা আমাদের বড় ভাল লাগে তাই একটু বেশী করে আমরা শুনতে চাই। তা আপনার সুযোগ মত সব বলবেন।

এইমাত্র কথক ঠাকুর আসরে যাবেন বলে হাত মুখ ধুয়ে তৈরী হয়েছেন, আর এর মধ্যেই গ্রামের বহু লোক ছুটে চলেছে উত্তর দিকে 'গেল গেল সব গেল গ্রামের আর কিছু রইল না' এই বলে। ঠাকুর গামছাখানা হাতে করেই বেড়িয়ে এসে দাঁড়ালেন পথের মাঝখানটায়। তিনি বলেন—কি হয়েছে আপনারা সব কোথায় যাচ্ছেন ছুটে? কে একজন বলে উঠল, আর ঠাকুর আপনারা

থাকুন ধর্মচর্চ্চা নিয়ে। আপনাদের কি আর বাহ্যদৃষ্টি আছে যে দেখবেন গ্রামটার সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ওঃ কি ভীষণ আগুন লেগেছে কৃষ্ণপুরের বাজারে আর সঙ্গে সঙ্গে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ল গ্রামের উপর।

ঠাকুর আর একটুও দেরী না করে ছুটে যান যে দিকটায় আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছিল। আগুনের তাপে সামনে এগিয়ে যায় কার সাধ্যি। গ্রামের লোকেরা সব যে যার মত ছুটে পালাচ্ছিল। ঠাকুর তাদের ভয়কাতর অবস্থা দেখে নিজের কাপড় এঁটে কসে পরে নিলেন। তারপর তিনি যুবক ছেলেদের ডেকে বলেন—শোন তোমরা বিপদের সময় ভয়ে পালিয়ে যেও না। এ সময় দূরে চলে গেলে গ্রামের বিষম'ক্ষতি হবে। আমি তোমাদের সকলকার সঙ্গে আছি। আমি এগিয়ে যাই তোমরা শুধু পেছন থেকে পর পর আমাকে পুকুরের পাঁক তুলে দেবে। ছেলেরা ঠাকুরের কথামত পুকুরের পাঁক তুলে দেয় ঠাকুর সেগুলি ক্রমশঃ জ্বলন্ত অগ্নিব উপর ছুড়ে দেন। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল অগ্নি যেন আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছে তখন বড় বালতি করে জল ঢালা শুরু হল। ঠাকুবের কাজ দেখে গ্রামশুদ্ধ লোক জল ঢালতে শুরু করেছে। আগুন আর কোথায় থাকে ? সে-দিনকার বিপদে ঠাকুর যে তৎপরতার সঙ্গে আগুনের সঙ্গে যুঝে-ছিলেন সে কথা আজও মনে হলে কৃতজ্ঞতায় প্রাণ ভরে উঠে।

গ্রামের সকলেই সে দিন বুঝেছিল কথক ঠাকুর শুধু কথকতাই করেন না, তাহার সমাজ সেবার আগ্রহ এবং শক্তিও অসীম।

কথকতা শুরু করে তিনি দাবানল—মোক্ষ কথার উল্লেখ করে

বলেন—বৃন্দাবনেও একদিন আগুন জ্বলে উঠেছিল চারিদিক থেকে। মাঝখানে পড়েছিলেন গোবৎস সহিত রাখাল সখা শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম কৃষ্ণ সখাগণ প্রাণভয়ে কৃষ্ণকে বলে—

ভাইরে—কানাই—বল কোথায় যাই—
আগুন জ্বলে চারি ধারে।
হল তাপিত অঙ্গ—মোদের খেলা ভঙ্গ—
আর যে তাপ সহে নারে॥

তখন কৃষ্ণ বলেন—ভাইরে শ্রীদাম ভয় নাইরে—আর ভয় করিস নারে আমাদের ঘরে যে নারায়ণ আছেন মা বলেন, তাঁর অনুগ্রহে আমাদের কোনো ভয় থাকিতে পারে না।

মা বলেছেন চোখ বুজে নারায়ণকে ডাকলে সব বিপদ দূর হয়ে যায়। আয় ভাই আজ তার পরীক্ষা করে দেখা যাক্। তোরা সব চোখ বুঝে আমাদের ঘরের ঠাকুর নারায়ণকে মনে মনে ডাক দেখি ভাই, কি হয় দেখা যাক্। কৃষ্ণের কথায় মুগ্ধ বালকেরা তখন চক্ষু বুঝিয়া মনে মনে ভয়ে ভয়ে নারায়ণকে স্মরণ করিতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু মানুষের বালকরূপ ধারণ করিয়াও অব্যাহত ঐশ্বর্য্য। কাজেই তিনি অগ্নিকে আহ্বান করে নিজের হাতে অঞ্জলিপুটে জলপানের ভঙ্গীতে অগ্নিপান করিলেন। অতি অল্পসময়ের মধ্যে অগ্নি প্রশমিত হল। অচিন্ত্যপ্রভাব গোবিন্দের শরণ গ্রহণ করলে আমাদের আর কোনো ভয় থাকবে না। ঠাকুর আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় এক ভক্ত এমন উচ্চ স্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করেছে—কি জানি কেন? তাব ক্রন্দনরোলে সেদিন আর অগ্রসর হতে পারলেন না।

সদানন্দ দাস। তার একটি কন্যা ভিন্ন আর কেহ নাই। এই বিধবা কন্যাটিই তাহার সংসার জীবনের শেষ চিহ্নরূপে অবশিষ্ট রহিয়াছে আর আছে তার ব্যবসায় লব্ধ কিছু অর্থ। অর্থ থাকিলেও তাহার প্রতি টান নাই, সদানন্দ ছোট একখানা কাপড় পরিয়াই সারাদিন কাটাইয়া দেয়। সাধুরা যেখানে বসিয়া হরিকীর্ত্তন করে সদানন্দের স্থান সেখানেই। বাড়ীতে খুঁজিলে প্রায়শঃ তাহাকে পাওয়া যায় না।

তার সংসারের প্রদীপ মেয়েটি বলে—বাবা কি আর বাড়ীতে থাকেন কোথায় কোন মহোৎসবে গেছেন—আজ তিন দিন।

নানা স্থানে উৎসবের আনন্দে সদানন্দ নাম সার্থক করে সে। আমাদের কথকঠাকুর লোকটিকে অনেক দিন ধরিয়া লক্ষ্য করেন। লোকটি খুবই বিনয়ী সর্ব্বদা যেন কি এক ভয়ে ভয়ে সকলের পশ্চাতে থাকিয়া অগ্রসর হয় এমন কি পথ চলিতেও সে আগে যাইয়া দাঁড়ায় না। কথকঠাকুর কথায় কথায় একদিন সুধন্য সাধুকে এই সদানন্দের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সাধুটি বলিলেন—ঠাকুর, সদানন্দ অনেক দিন ধরিয়া সদাচার পালন করে, মেলা মহোৎসবে হরিকীর্ত্তনে সে আমাদের নিত্যসহচর। এই সংসারে তার ঐ বিমলা ছাড়া আর কেউ নেই। তবে সদানন্দকে ইচ্ছা থাকিলেও আমরা সকলে সমানভাবে আমাদের সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারি না।

তার কারণ সে অস্পৃশ্য কুলে জন্ম গ্রহণ করেছে! সে যে তার স্ত্রী যত দিন বেঁচে ছিল চামড়ার ব্যবসা কর্ত্তো। তার স্ত্রী মারা যেতে সে ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে বটে, ঐ চামড়ার ব্যবসা কর্ত্তো বলেই আমরা তার সঙ্গে মেলামেশা কর্ত্তে একটু কিন্তু মনে করেছি।

এখন সে অবশ্য আমাদের সঙ্গে সর্ব্বত্রই যাওয়া আসা করে, তবে আমরা একটু দূরে দূরে থেকেই তাকে নিয়ে চলি।

সদানন্দেব অনেক দিনের সাধ সে একটি সাধু-সেবা মহোৎসবের আয়োজন কবে, কিন্তু সব সাধুরা একত্র হ'য়ে কোনো দিন একমত হতে পারেন নি—এই মহোৎসব অনুষ্ঠান বিষয়ে। ঠাকুব, আপনি যদি তার এই মনোবাসনা পূর্ণ করে দিতে পারেন খুবই ভাল হয়। ঠাকুর বলেন সদানন্দ সাধু, সে সাধুদের সঙ্গেই মেলা মহোৎসব করে বেড়ায়। সে সদাচারী তাব মহোৎসবে বাধা কোথায়?

সুধন্য বলে ঠাকুব, বাধা তো কিছুই নেই, কিন্তু সমাজের বন্ধন বড় কঠোব। এখনো লোকে সদানন্দের সেই বিমলা যাকে শ্বশুর বাড়ী থেকে কি এক দোষ দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল তার কথা বলে সদানন্দকে কতই না অপমান করে। আরে মর মেয়েটার স্বামী ছিল একটা মাতাল। সেটা কোথায় কি অন্যায় করে এসেছে তার জন্য যত দোষ বিমলাব। কচি মেয়েটাকে তার শ্বশুর কোন প্রাণে তার বাপের কাছে পাঠিয়ে দেয়—আর নিবর্থক তাকে দোষী করে মন্দ বলে।

আমরা তো ছেলে বেলা থেকে বিমলাকে দেখেছি সে কোনো দিন মুখ তুলে চেয়ে দেখে না, সব সময় মাথা তার নীচু, মাটির মানুষ অথচ তার কপালে অত দুঃখ। যাক্ সে কথা, ঠাকুর এই বিমলা আর সদানন্দের সেই পুরাণো চামড়ার ব্যবসাই তার কাল হয়েছে। কবে কোন দিন সে চামড়ার ব্যবসা কর্ত্তো সেই জন্য সমাজের কেউ তার সঙ্গে ব্যবহার কর্ব্বে না। আচ্ছা, বলুন তো ঠাকুর, বড় বড় শহরে কত ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের ছেলেরা জুতোর

দোকান করছে তাতে তাদের জাত যায় না, আর এই আমাদের গ্রাম এখানে কবে কোন দিন সদানন্দ দাস চামড়ার ব্যবসা করেছিল—তাই তাকে নিয়ে আমাদের সমাজ বলবে এটা কি একটা কথা হল ? এর কি একটা বিচার নেই—প্রতিকার নেই ?

ঠাকুর বলেন—সুধন্য তুমি একটিবার সদানন্দকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলগে ;

বারীন মুখুটি গ্রামের প্রধান। তিনি ঠাকুরকে বড় শ্রদ্ধা করেন। তার স্ত্রী ঠাকুরকে তার বাড়ীতে নিয়ে মাঝে মাঝে মর্ত্তমান কলা, গরম দুধ, ঘরের তৈরী লাড়ু খুব যত্ন করে খাওয়ান। মুখুটির বড় মেয়েটি এই বৎসর আই-এ পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা থেকে বাড়ী ফিরেছে। সুন্দর মেয়েটি—ঠাকুরের কাছে বসে সে কত কথা জিজ্ঞাসা করে, আর ঠাকুরও তৃপ্তির সহিত লাড়ু খেয়ে মেয়েটির কথার জবাব দেন। আর মনে মনে ভাবেন—যাক্ এই গ্রামের মধ্যে আমার গুণের সমজদার এই একটা গুণী মেয়ে আছে। ওকে দিয়ে আমার অনেক কাজ হতে পারে। আর কিছু না হলেও মেয়েদের মধ্যে কীর্ত্তন প্রচার করার খুবই সুবিধে হবে। একটা মেয়েদের সমিতি গঠন করে কীর্ত্তন মণ্ডলী করা যেতে পারে।

আজ সকাল সকাল পাঠ শেষ করে ঠাকুর সন্ধ্যার পর মুখুটি বাড়ীতে এসে বসেছেন। ছন্দার মা, মুখুটি গিন্নী খাবার যোগাড় করছেন। ছন্দা ঠাকুরের কাছে বসে আজকের পাঠের কি একটা কথা তার নোটবইয়ে টুকে রাখছে। ঠাকুর খুবই উৎসুক হয়ে ছন্দার লেখার দিকে চেয়ে আছেন।

এই যে মুখুটি মশায় আসুন, আজকের কথকতা কেমন শুনলেন? দেখুন, সভায় আপনাদের মত গুণী জ্ঞানী লোক থাক্‌লে আমার কথার সুরই পালটে দিতে হয়। এই ধরুন ছন্দা, সে লেখা-পড়া শিখেছে। একটা কথা ব'ল্লে সে বোঝে। কাজেই ওদের মত শ্রোতা যদি কাছে বসে কেমন করে আর সাধারণ গল্প ব'লে কথা শেষ করি? কাজেই দুচারটা তথ্যপুর্ণ গবেষণামূলক বা দার্শনিক কথার অবতারণা করতেই হয়। অবশ্য তাতে করে সাধারণ শ্রোতার পক্ষে একটু কি রকম মনে হয়, হলোই বা, তাব'লে কি রোজই এক সুরে গান আর গল্প করে যেতে হবে, তবে শাস্ত্র ব্যাখ্যার যেটুকু রহস্য সেটুকু আর কোথায় বলব? সাধুদের দল থেকে আজ আমায় একজন কে বলছিল—ঠাকুর কথাগুলি বড় শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আজ যে একটাও গান হল না কেবল কোথাকার কোন পণ্ডিত কি বলেছেন সে কথা, ওগুলি শুনে আমাদেব কি হবে? আমবা চাই একটু প্রাণ জুড়ানো হরি-কথা যাতে চোখে জল আসে, প্রাণে ভরসা জাগে। এই সব তত্ত্বকথায় যে শুধু প্রাণ শুকিয়ে যায় কোনো ভরসা পাইনা। মনে হয় আমরা ভগবানের কাছ থেকে অনেক দূরে প'ড়ে আছি। আমাদের আর কোনো উপায় নেই। এভাবের কথা গ্রহণ কর্ব্বার কটা লোক আছে। কেন মুখুটি মশায়! এই তো আমি দেখ্‌ছি ছন্দা বাড়ী এসেই আমার কথাগুলি টু'কে ফেলছে এ বকম একজনও যদি মনোযোগ করে আমার কথাগুলো ধরে রাখতে চেষ্টা করে, আমি মনে করি আমার কথকতার সেই-খানেই সফলতা।

ঠাকুর মশায়, সে কথাতো ঠিকই—মুখুটি মশায় বলেন; তবে

কিনা সাধারণ লোকে যাতে বেশ মেতে যায়, সেভাবেই আপনাকে কথা লাগাতে হবে। দু'চার জন শ্রোতার দিকে লক্ষ্য করে তো আর অত বড় সভায় কাজ চলে না। ঠাকুর এখন তো একটি বিশেষ সমস্যার কথা। পাড়ার কয়েকজন সাধু এসে ধরেছে, সদানন্দের মহোৎসব করিয়ে দিতে হবে। তা আমি বলছি ঠাকুরের সঙ্গে আগে পরামর্শ করে দেখি তিনি এ বিষয়ে কি বলেন। আপনি শুনেছেন তো সদানন্দর ইতিহাস। সে লোকটা মন্দ নয়, দেবে দ্বিজে তার খুব ভক্তি। আমাদের সে বেশ মান্য করেই চলে। তবে সে ঐ চামড়ার ব্যবসা কর্ত্তো বলে তাকে নিয়ে অনেক কথা উঠেছে।, তা দেখুন এখন প্রগতির যুগ চলেছে এখন কি আর সে ত্রেতা যুগ ধরে বসে থাকলে চলে। আপনি তো কথায় কথায় যে সব দৃষ্টান্ত দেন তাতে তো আমাদের ঐ কথাই মনে হয় 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ'। আর চক্ষের উপরেই তো দেখছি কলকাতার বড় বড় খাবার দোকান আর হোটেলগুলি। কি ভাবে খাওয়া দাওয়া চলছে, আর সে কি সব খাদ্য যার নাম করিলেও সমাজের লোকেরা প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিবেন, সেই সব খাদ্য এখন পুষ্টিকর—না খেলে বাবুরা চলতে পারেন না—স্বাস্থ্য টেঁকেনা আর up to date হওয়া যায় না। সেখানে ভট্টাচার্য্য আর দাস সাহেবের কোনো জাতের বিচার নাই তো। যত বিচার এসে পড়েছে পাড়া গাঁয়ের বিয়ে বাড়ীতে আর হরি-কীর্ত্তনের মহোৎসবে। এ আর কদিন চলতে পারে? আমার কিন্তু মত সদানন্দের অনেক দিনের আশা পূর্ণ করে দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। এই দেখুন না. সেদিন বিশ্বেশ্বর বাবুর ছেলে কোথাকার এক অজানা পরিবারের

অবশ্য এখানে রটিয়েছে ব্রাহ্মণের, সেই এক মেয়ে নিয়ে এসে হঠাৎ 'বৌ' ভাত লাগিয়ে দিলে। পাড়া শুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ—সে কি ঘটা, সবাই তো সে বিয়েতে খেয়ে দেয়ে গুণ গেয়ে এল, কই সেখানে কোনো বিচার হল না তো? যত বিচার হরিনাম নিয়ে আর মহোৎসব নিয়ে? এ আর যেন কোনা মতেই ভাল লাগে না ঠাকুর বলেন—মুখুটি মহাশয়! আজ যে কথাগুলি বলছেন আমি সেটা অনেক দিন আগেই বলি বলি করেও বলা হয় নি। আমার মুখে এসব কথা শুনে হয় তো এক দল অমনি বলবে—এই যত হরি-বোলার দলগুলিই সমাজ-টাকে একেবারে অধঃপাতে দিতে চলেছে। সদানন্দ সম্বন্ধে আপনি বলছিলেন। তাকে আমি বেশ জানি সে দীর্ঘকাল সাধু ভাবে জীবন যাপন করছে—তা ছাড়া তার মত বিনয়ী নিরভিমান বড় দেখা যায় না; এরূপ লোককে যদি আদর্শ সাধু বলে গ্রহণ না করা যায়, তবে আর সাধু বলি কোন গুণ-দেখে? আপনি যদি অগ্রসর হয়ে তার সঙ্কল্পিত মহোৎসবটি করিয়ে দিতে পারেন,—আমার মনে হয়, এটাও একটা সাধু কাজ হবে।

দু'চার দিনের মধ্যেই গ্রাম গ্রামান্তরে সংবাদ গেল সদানন্দের মহোৎসব এই সংক্রান্তি দিনেই হবে। কোথা থেকে সব কীর্ত্তনের দল আসতে শুরু করেছে। কত বৈরাগী আর বৈষ্ণব! নিমন্ত্রণের যেন আর প্রয়োজন নেই। বৃহৎ বটবৃক্ষ তলে দলে দলে বৈষ্ণবেরা বসিয়া খঞ্জনী আর গোপী যন্ত্রে আত্ম-তত্ত্ব গান ধরল। কত বাউল দোতারা বাজিয়ে স্থির দৃষ্টিতে ভাবমগ্ন হল। বৈরাগিণী বৈরাগীর গা ঘেঁসিয়া বসল, 'রাধা প্রেমের কত জ্বালা' বলে মুক্ত কণ্ঠে সুর

ধরল। মুখুটি বাড়ীর বড় পুকুরের তিন ধারে কত দোকান বসল চিড়ে, দধি, খৈ, মুড়খি, কলা, বাতাসার সারিবদ্ধ দোকান শোভা-শূন্য স্থান পূর্ণ করে ফেলল। ছোট ছোট খেলনার দোকান আর তার পাশে হল—দুদিনের মধ্যে বেশ জঁাকালো একটি মেলা। জমিদারের লোক এল দোকানীর কাছে কিছু "তোলা" কিছু "পয়সা" আদায় করে নিল কিছুটা জমিদারের সেরেস্তায় জমা দিয়ে বাকীটা নিজে আত্মসাৎ করল। সন্ধ্যার সময় শঙ্খ ধ্বনিতে চারিদিক্ মুখরিত হয়ে উঠল, বটবৃক্ষতলে মুক্ত প্রান্তরে একটি আসন রচনা হল। পাশে পাশে সব সাধুর দল মৃদঙ্গ করতাল নিয়ে হরি-কীর্ত্তন আরম্ভ করে দিল। ধূপধুনার গন্ধে আমোদিত সেই সভার স্থানটি। গ্রামের প্রধান ও নবীন সবাই এল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরাও গাছের তলায় অবিচারে বসে পড়লেন হরি-কথার আকর্ষণে।

ঠাকুর যখন কথা বলবেন, তার আগেই একটি মেয়ে এসে প্রণাম করে ঠাকুরের গলায় একটি ফুলের মালা পরিয়ে দিলে। হাসি মুখে সে ঠাকুরকে বলে আপনাকে দেবো বলে মালাটি আমি দুপুর থেকে গেঁথেছি। ভাল হয় নি? ঠাকুর অল্প কথায় বলেন—খুব সুন্দর মালা অনেক দিন এমন মালা কথকের ভাগ্যে হয় নি। মেয়েটিকে ঠাকুর বলেন—তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি গান গাইতে পার, একটি গান করতো এই নাও হারমনিয়মটা এগিয়ে দাও তো সোনামণি।

মেয়েটি গান ধরে—

নাচত অঙ্গনমে নন্দ দুলাল।
গোপ গোপাঙ্গনা বোলত ভাল ॥
সুন্দর মোহন শোহে সহজ রসাল।
গলে বৈজয়ন্তী দোলত মাল ॥
পীত পটাম্বর কাঁজল কাতি।
মণিময় আভরণ প্রতি অঙ্গ জ্যোতি ॥
রূপ নেহার ত সবিলাস গোপী।
অন্তর পূরণ প্রেমময় লাল।

ঠাকুর বলেন তোমায় এ গান শিখিয়েছে কে? এ গান আমার অনেক দিন আগেকার রচনা। সেই সিদ্ধেশ্বর মাষ্টারকে আমি গানটি লিখে দিয়েছিলাম। তুমি বুঝি তারই ছাত্রী। শোভনা বলে আজ্ঞে আমি তাঁর কাছেই গান শিখি।

ঠাকুরের অনেকদিনের ইচ্ছা একটা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সে বিদ্যালয়ে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে সাধারণ বিদ্যাকেন্দ্রগুলি হতে। এই মহতী বাসনা তাঁর জেগেছিল একবার হরিদ্বার ভ্রমণ সময়ে। ঠাকুর সেকথা আমাদের বলেছিলেন। তিনি যখন হরিদ্বার গুরুকুলে দর্শনার্থী হয়ে যান, তখন সেখানকার শিক্ষক পরিদর্শক তাঁকে খুবই আদর করে সবকিছু বেশ পরিষ্কার করে দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে যে ঠাকুরের মনে একটা প্রভাব পড়ে তা তিনি অনেকবার বলেন। সেখানে তিনি দেখেছিলেন খুব বিস্তীর্ণ জমি আর তার মধ্যে ছাত্র ও শিক্ষকদেব থাকবার স্থান বিদ্যালয়, চিকিৎসাকেন্দ্র, বাণিজ্যকেন্দ্র, কারখানা, কারিগরি শিক্ষার স্থান, আরো কত সুন্দর ব্যবস্থা। ছাত্রদেব থাকার ও খাওয়ার

অতি চমৎকার বন্দোবস্ত বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ করে দিয়েছেন। তাদের ক'জন করে একটি একটি দল আর তাদের অভিভাবক শিক্ষক একজন করে। এইভাবে সেই বিশাল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ও শিক্ষকগণ যেন স্বতন্ত্র কতগুলি গোষ্ঠী অথচ তাহারা সকলেই এক উদ্দেশ্য এক তন্ত্র এক শিক্ষা এক সাধনা নিয়ে সেই পূর্ণায়তন গুরুকুলের পরিপুষ্টি বিধান করছেন।

হরিদ্বারে প্রাকৃতিক শোভার অবধি নাই, আর চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশে এই স্থানটি যেন এক অপূর্ব্বমায়া ছড়িয়ে আছে দীর্ঘকাল। এই বিদ্যালয়ের কত কৃতিছাত্র তারা ভারতে ও ভারতের বাহিরে নানাপ্রকার কর্ম্মকুশলতার জন্য প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন। সেখানে তিনি দেখেছিলেন—সুন্দর একটি চিত্রশালা। এই চিত্রগুলির মধ্যে প্রাচীনতম যুগের বহু দেব দেবী ও পৌরাণিক চিত্র সংগৃহীত আছে। বহুপ্রকার মানচিত্র ও নক্সাও সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐগুলি শাস্ত্র ও সাহিত্যানুরাগীর চিত্তাকর্ষক। ঠাকুর যখন সেগুলি একটির পর একটি দেখছিলেন তখন তাঁহার এরূপ তন্ময়তা হয়েছিল যে সঙ্গী বন্ধুগণ সেখান থেকে যথাসময়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করা এক সমস্যা বলে মনে করছিলেন। ঠাকুরও একদিন কথা-প্রসঙ্গে সেদিনের অনুভূতির বর্ণনা করে বলেছিলেন—দেখ, সুশান্ত, আমার কিন্তু পঞ্চাশের অধিক বয়স অথচ গুরুকুলে যখন আমি ছোট ছোট ছেলেদের মুখে বেদমন্ত্র উচ্চারণ ও আবৃত্তি শুনছিলাম তখন আমার কি মনে হয়েছিল জান? আমি ভাবছিলাম আর দেশে ফিরে যাব না। এইখানে জীবনের বাকীটা কাটিয়ে দেবো

আর এই ছোট্ট ছেলের চঞ্চলতা আর সরলতার সঙ্গে প্রাণের তানপুরা মিলিয়ে নিয়ে বেদমন্ত্রের গানই গাইব। সে কি আনন্দ আমার হয়েছিল তা আর তোমায় বলে কি বুঝাবো বল? আমাদের এই বাংলার মাটিতে কি এরকম একটা বিদ্যালয় হতে পারেনা? অবশ্য তুমি বলবে বাংলাদেশেও ওরকম আবাসিক বিদ্যালয় ও আশ্রম তো অনেকগুলিই আছে। কিন্তু আমি বলি কি জানো এখানে প্রায়শঃ দেখা যায়, বিদ্যাকেন্দ্র বা আশ্রম যাই একটু মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো অমনি সেখানে বিলাসের সামগ্রী প্রবেশ কর্ত্তে থাক্‌লো আর বিদ্যার্থী ও শিক্ষক মূল আদর্শ হতে বিচ্যুত হলো। আমি সেটি চাইনা। আমি চাই শুধু ত্যাগময় জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত শিক্ষক ও ছাত্র। ব্যবহারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবেশে সে জাতীয় কেন্দ্র গড়ে তোলা একটা বিষম কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; তবু তোমরা সব্বাই যদি আমার মনের বাসনাটিকে সার্থক করবার জন্য একটু সহযোগিতা করো তাহলে খুব ছোট হলেও এ রকম একটা বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হতে পারে। তবে মনে রেখো স্থাপন করা আর নিয়মিতভাবে পরিচালিত করা এ দুয়ের মধ্যে অনেকখানি ভাববার আছে। এই দেখনা দেশে কত বড় বড় মন্দির আজও আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সেই মন্দির প্রতিষ্ঠাতার প্রাণের উদার দানের সাক্ষ্য দিতে। কিন্তু যাও তো কোনো মন্দিরে দেখতে পাবে সেখানে দেবতার প্রসন্নতা মাত্র নেই। এই দেখনা সেদিন গিয়েছিলাম সর্ব্বমঙ্গলা দর্শন করতে। এই দেবতার কত মহিমা কত পূজা আর কত উৎসব ছিল একদিন। আজ দেখি সেখানে মহাশূন্যতা।

অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন, নেই কোনো দরদ, নেই কোনো প্রাণের স্পন্দন। চারিদিকে আবর্জনা আর অযোগ্য সেবকের পরিচায়ক অনাদরের চিহ্ন। কত শিবমন্দির আজ পরিত্যক্ত কত দেবতার মন্দির ভগ্নস্তূপে পরিণত। কেন এরূপ হয় বল্‌তে পার? এর জন্য দায়ী কর্ব্বে কাকে? কালকে? আমার মনে হয় এজন্য দায়ী আমরাই। আমরা আমাদের উত্তরাধিকারীদের এরূপ কোনো শিক্ষা দিইনা যাতে তারা আমাদের শ্রদ্ধা বিশ্বাস ভক্তি ও জ্ঞানের যথার্থ বাহক ও ধারক হতে পারে। আমরা নিজেদের শ্রদ্ধাতেই শ্রদ্ধাহীন হয়ে লৌকিক জগতের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে আকৃষ্ট করি আমাদের পরবর্ত্তী সমাজকে। তাদের কাছে জড় জগতের সুখ সুবিধাগুলি চমৎকৃতি নিয়ে আসে এবং তাদের মনকে প্রভাবান্বিত করে তোলে। আমাদের অধ্যাত্ম জীবনের সে ভাব আমরা সংক্রমণ করতে পারিনা তাদের অন্তরে। কাজেই কালে কালে যে আমাদের পরিবর্ত্তন ঘটে উহা জড় সুখের টানেই। আমাদের এখন কর্ত্তব্য এই একটানা স্রোতের মুখে ভারতীয় আদর্শে পাষাণ চাপা দেওয়া। কতদূর কি হবে তা আমি এখন বল্‌তে চাইনা তবে কর্ত্তব্য বিচারে আমাকে বলতেই হবে যে, আমরা যেন আমাদের আদর্শকে ভুলে না যাই।

এই দেখনা আমাদের ঘরের মেয়েরা যে সব ব্রত পূজা আচরণ করত তাদের জীবনের প্রারম্ভ থেকে সেগুলি তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে সংসারের কর্ত্রীরূপেও অনুপ্রেরণা যোগাতো ধর্ম-কর্ম দান ব্রতে। বর্ত্তমানে সে সব ব্রত লোপ হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না কেননা মেয়েরা যারা স্কুলে কলেজে পড়বে তাদের তো সময়ই নেই অন্য

কোনো দিকে মনোযোগ করবার। যদিও কোনো ছুটি ছাটা থাকে সেগুলিও আধুনিক কালের নানা প্রকার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজনে ও হুল্লোরের মধ্যেই অতিবাহিত হয়ে যায়। যথার্থ চরিত্র গঠনে নৈতিক শিক্ষার অনুকূল অনুষ্ঠান প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না। সিনেমার আমোদের কথাতো আর বলেই কাজ নেই। ওটাই হয়েছে এখন সামাজিক জীবনে একমাত্র আনন্দের অবলম্বন। সুবৃহৎ শহর হতে দূরের গ্রাম পর্য্যন্ত সিনেমার প্রভাব। এগুলির মধ্যে যে কিছুমাত্র শিক্ষণীয় নেই তা আমার বক্তব্য নয়; তবে যে সব চিত্র চিত্তবিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে কোনো সাধুমহাত্মা বা দেবদেবীর চরিত্র অঙ্কন করে জন জাগরণে সহায়তা করতে পারে সে সব চিত্র প্রদর্শনীতে লোকের ভীড় নেই। দেখবে যত সব আমোদ প্রমোদ পরিপূর্ণ আপাত রমণীয় চিত্র সেগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। আর ব্যবসায়ীরাই বা কি করিবেন, তারাও চল্‌তি চিত্র তৈরী করবার জন্য নিত্য নূতন নৈতিক অধঃপতনের ছবিগুলি ধরে বাজারে সস্তামূল্যে সকলকার আনন্দ দান করতে যত্নবান। বাংলাদেশে যত ছবি হয় তার মধ্যে প্রায়শঃ দেখা যায় যেন সেগুলি ভারতের প্রাচীন যুগের আদর্শকে চূর্ণিত করে অগ্রগতির চরম পরিচয় দেবার জন্য বদ্ধপরিকর। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতির পরিকল্পনাগুলি একে একে পরিগৃহীত হতেছে। এই সিনেমা জগতেও হয়তো এখনো নানাদিক্ দিয়ে সংস্কারের প্রয়োজন আছে।

বিশ্বেশ্বর বাবু শ্রীহরি পূজা কর্ব্বেন এটা তাঁর অনেক দিনের মানস। ঠাকুরকে দেখে তাঁর বড়ই পছন্দ হয়েছে। বিশ্বেশ্বর শর্ম্মার নাম এ অঞ্চলে আবালবৃদ্ধ সকলকার শ্রদ্ধার উদয় করে। কেননা তাঁর মত পরোপকারী দরিদ্রের বান্ধব আর কেউ নেই। ঠাকুরের কথকতা শোনা অবধি এই বিশ্বেশ্বর বাবু যেন কেমন মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি শুধু বলেন এমনটি আর দেখিনি এই তো আমার ষাট বৎসর পেরিয়ে একষট্টি চলেছে। কত নাটক কত গায়ক আর কত কথক দেখেছি। আমার মনে হয় লোকগুলি যখনই একটা যোগ্যতা লাভ করে তখনই মনে জাগে অর্থ লালসা। আর এইটাই প্রধান হয়ে সাধকের জীবনের পারমার্থিক ভাব পড়ে থাকে পিছনে আর প্রাচুর্য্য হয় ছলনার। যে কোনো উপায়ে অর্থ সংগ্রহ কর্ব্বার লালসা রাক্ষসীর মত পেয়ে বসে মানুষটাকে আর দিনের পর দিন তাহার মনুষ্যত্ব হয় ক্ষীণাতিক্ষীণ। বিশ্ববাবু ঠাকুরকে চেপে ধরলেন তার মঙ্গলকামনায় ঠাকুর তার বিষ্ণু-পূজা করে দেবেন। আয়োজন শুরু হল। পূজার দ্রব্য একের পর এক আনা হল। শুভ সময় যোগ লগ্ন দেখে ঠাকুর পরিষ্কার কৌষেয় বসন পরিধান করে উত্তরীয় ধারণ পূর্ব্বক কম্বলাসনে পদ্ম আসন করে বসলেন।

তার সেই সময় শান্ত সৌম্য স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দর্শন করে সকলেই বলেন এ যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মচর্য্য মুর্ত্তি!

বিশ্ববাবু ঠাকুরের পাশেই বসে পূজার উপচার এগিয়ে দিচ্ছেন। আহা ঠাকুর যখন অর্দ্ধ স্তিমিত নেত্রে পদ্মপলাশলোচন ভগবান নারায়ণের ধ্যান করছিলেন। আর তার দুই গণ্ডে প্রবাহিত হচ্ছিল অন্তরের স্বচ্ছ প্রেমধারা তখন যে কোনো দর্শকের প্রাণও যে

ভগবদ্ বিভূতির মহামহিমায় মগ্ন হয়েছিল সে সম্বন্ধে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নেই। অস্পন্দ দেহে অপলক দৃষ্টিতে মূর্ত্তির আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করছিলেন ঠাকুর আর মাঝে মাঝে যেন অস্ফুট মধুর ধ্বনি উঠছিল 'নমো নারায়ণায়'। ঠাকুরের অবস্থার যতই মগ্নতার দিকে অগ্রগতি হচ্ছিল লোকের মুখের কথাও যেন ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল দর্শকরাও একেবারে নিস্তব্ধ নিশ্চল। তখন নারায়ণের আঙ্গিনায় যেন নিস্তরঙ্গ সরোবরের শোভা, তৃপ্তি ও আনন্দে প্রতিটি নর নারীর মুখ বিকশিত, নয়ন অশ্রুসিক্ত। সে দিনটা যে কি ভাবে একটানা ভক্তির আবেশে অতিবাহিত হয়ে গেল সে কথা স্মরণ কর্ত্তেও আনন্দ হয়।

নারায়ণ ঠাকুরের মহিমা যে কি তা আমরা জানিনা, বুঝিনা, তবু আমরা তাঁর পূজা করি। আমাদের কথক ঠাকুর নারায়ণ পূজায় যে ভাবে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন তাতে কিন্তু অনেকের মনে হয়েছিল যেন তিনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ, পূজার পর তিনি যখন ঠাকুর দালানের এক পার্শ্বে আসনে বসেছেন আর নরনারী আকুলভাবে তাহার পাদস্পর্শ কর্ব্বার জন্য ছুটে চলেছে তখনকার দৃশ্য সত্যই অভক্তের মনেও ভক্তির ভাব জাগ্রত করতে সমর্থ। দেখলুম সেদিন গ্রামের প্রধান এক দুশ্চরিত্র গুণ্ডা সেও এসে ঠাকুরের পায়ের ধূলা নিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ ঠাকুর যেন চমকে উঠলেন। মনে হল এক দিব্য আলোক তার মুখের উপর পড়ল। তিনি একটানা কতগুলি কথা বলতে লাগলেন। তার কথার যেটুকু মনে আছে সেগুলি আমি আপনাদের না দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারিনা। তিনি বলেন,

জীবনের গভীরতম সত্যোপলব্ধির পথ পরিত্যাগ করে জনগণ যদি ব্যবহারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ভরসায় প্রলুব্ধ হয় উহা যে মনুষ্যত্বের অবমাননা ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলতে চাই লৌকিক বিষয় ছাড়াও মানবের জীবন মন আরো কিছু চায় উহাই পরমার্থ।

তথাকথিত সভ্য জগৎ সেই অমৃতের সন্ধান করে না বলিয়াই মারণাস্ত্রের পরীক্ষা। একটি আঘাতে আশি হাজার বা লক্ষাধিক লোককে ধ্বংস করিবার বিদ্যাকেই আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া মনে হইতেছে এই ভ্রান্তি নিরসন করিতে হইবে। অধ্যাত্ম জীবনালোক-পরমাণুতে এক মানবাত্মা শত কোটি মানবের মনে অমৃতের উৎস-মুখ খুলিয়া দিয়াছে। মৃত্যুর বিভীষিকা ধ্বংস করিয়া মৃত্যুময় সংসারে যাহারা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন সেই অমৃত লোকের সাধকগণই পরাবিদ্যা দান করিয়াছেন বলিতে হইবে। আমরা ভারতীয়েরা সেই পরাবিদ্যা দানের অধিকারী। অনুশীলনে অধ্যাত্ম-বিদ্যার পরমোৎকর্ষ সংসাধিত হউক। জনগণ যেন এই বিদ্যাবিমুখ না হয়।

যাহারা মারণাস্ত্র প্রস্তুত রাখিয়া সমাজ কল্যাণ সাধন করিবে বলিয়া মনে করে তাহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রয়োজন। ভয়ের ভিত্তিতে শান্তিময় সমাজ ব্যবস্থা একান্ত অচল। বুদ্ধি বৃত্তির প্রয়োগেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শক্তি সামর্থ্যের প্রকাশ হয়, ইহা যাহারা মনে করেন তাহারা হয়তো হৃদয়বান ব্যক্তির পরিচয় পাননি। সহানুভূতিশীল অধ্যাত্ম সম্বিৎসম্পন্ন ব্যক্তি অফুরন্ত শক্তির উৎস। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে যাহারা প্রাণের দেউলে আদর করেন

তাহাদের শক্তি অপরিমেয়। পরমেশ্বর উপাসনায় জীবন আনন্দ আলোকে উজ্জীবিত হয়—নবরূপে রূপায়িত হইয়া সর্ব্বত্র তাহার প্রভা বিকীর্ণ করে।

বীর্য্যময় জীবনে তাপ আছে কিন্তু উহা আনন্দে পূর্ণ। পাখীর গায়ের তাপে তাহার শাবকের চক্ষু ফোটে তেমনি শক্তিমান পুরুষের প্রাণময় প্রভাবে আমাদের জ্ঞানের বিকাশ হয়। প্রাণস্পন্দনকে অভিনন্দিত করিতে সমর্থ মহাপুরুষের প্রভাব। দিব্যালোক ভিন্ন জীবনের জড়তা দূর হইবার নয়। বিশ্বের আনন্দালোক দর্শনে দিব্য জীবনের সংস্পর্শ একান্ত প্রয়োজন। মহতের অনুগ্রহেই জড় ভোগসঙ্কুল বিশ্বব্যাপারেও তাঁহার আনন্দ লীলার মাধুর্য্যানুভব সম্ভব হয়।

ঠাকুর কথা বলিতে বলিতে যেন কেমন হইয়া গেলেন। বিশ্বেশ্বর বাবু ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন। ঠাকুর তখন ভাবরাজ্যে, বাহিরের চেতনা ছিলনা বলেই মনে হল। সন্ধ্যার পর তিনি কথকতা করিতে বসিলেন। প্রথমেই একটি গান ধরিলেন। গানটি অনেকবার শুনেছি কিন্তু পুরাণো হয়নি—

(গান) হৃদি বৃন্দাবনে বাস—যদি কর কমলাপতি—ওহে ভক্তপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা সতী। মুক্তি কামনা আমারি হবে বৃন্দে গোপনারী, দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী। (আমায়) ধর ধর জনার্দ্দন পাপ ভার গোবর্দ্ধন, কামাদি দুষ্ট কংসচর—ধ্বংসকর সংপ্রতি। বাজায়ে কৃপা বাঁশরী, মন ধেনুকে বশ করি তিষ্ঠ হৃদি গোষ্ঠে পুরাও ইষ্ট এই মিনতি।

আমার প্রেমরূপ যমুনা কুলে আশা বংশী বটমূলে—সদয় ভাবে, স্ব দাস ভেবে সতত কর বসতি।

যদি বল রাখাল প্রেমে, ঋণী আছি ব্রজ ধামে, জ্ঞান হীন দীন রাখাল তোমার দাস হবে হে দাশরথি—

ঠাকুরের কণ্ঠ আর দাশরথি রায়ের গান এ যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ। এক দিকে বিশ্বেশ্বর বাবুর প্রভাব, তাহাতে নারায়ণ পূজা। আবার ঠাকুরের কথকতা, গ্রাম গ্রামান্তর হতে লোক সমাগম হয়েছে। বসবার স্থান পাচ্ছেনা। তবু তাদের উৎকণ্ঠা আগ্রহের অবধি নেই। ঠাকুরের দুটো কথা তাহারা শুনবেই।

কথার আগে গুরু বন্দনা হল। ঠাকুর বলেন আপনারা জানেন শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন নবাঙ্গ ভক্তির এক একটি প্রধান সাধন। এই বন্দনা যে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সাধনা সে বিষয়ে আলোচনা অল্পই দেখা যায়। অথচ প্রাচীনকাল হইতে স্বাভাবিক মনোবৃত্তিব শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শনেব সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রক্রিয়া স্বরূপে আপন আপন কার্য্য সিদ্ধির অভিলাষে পূজ্যজনেব বন্দনা করিয়াছেন, তাহাতেই তাহার শ্রীকৃষ্ণ লাভ হইয়াছে। তাহার জন্য এই সাধনাই ফলদায়ক হইয়াছিল। নবাঙ্গ ভক্তির যে কোনো একটি সাধনেই পরম সিদ্ধি লাভ হয়।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দ্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্বস্বাত্ম নিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥

এই সঙ্কেত হইতে দেখিতে পাই কি ভাবে কোন্ ভক্ত

ভগবানকে সম্যক্ রূপে আপনার করিয়া লইয়াছেন। রাজা পরীক্ষিৎ অর্জ্জুনের পৌত্র অভিমন্যু ও উত্তরার পুত্র। তিনি সাক্ষাৎ ভগবৎকৃপায় গর্ভাবস্থানকালে ব্রহ্মাস্ত্র হইতে অভিরক্ষিত। ইনি প্রায়োপবেশন করিয়া গঙ্গাতীরে শুকমুখ নির্গলিত ভাগবত কথামৃত আকণ্ঠ পান করিয়া সপ্তাহ কালের মধ্যেই অমর জীবন লাভের অধিকারী হইলেন। কি অদ্ভুত তাঁহার হরিগুণানুবাদ শ্রবণ-নিষ্ঠা। ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেব শুধু এই কথা কীর্ত্তনেই কৃতকৃতার্থ। তাহাকে বার বার নমস্কার করি। প্রহ্লাদের কথা আর বলিব কি? তাহার কথাতো কতবারই শুনিয়াছেন। তাহার ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন স্মরণ। এই স্মরণামৃতই তাহাকে অস্ত্র-শস্ত্র অগ্নি জল পর্ব্বত বিষ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পরমানন্দময় ভগবানের অনুভব প্রদান করিয়াছে। শ্রীলক্ষ্মীদেবী ভগবানের পাদপদ্ম মকরন্দ আস্বাদন পাইয়াছেন। তাই চিরচঞ্চলা হইলেও তাঁহার পাদপদ্ম সেবনে তিনি সর্ব্বদাই নিরতা হইয়া আছেন। পৃথু মহারাজ ক্ষত্রিয়কূলে ভগবদবতার। রাজন্যবর্গের মধ্যে তিনি আদি রাজা। তাহারই নামে পৃথিবীর নাম। এই পৃথুরাজা রাজার ঐশ্বর্য্য উপচার প্রদান করিয়া ভগবানেব পূজার প্রবর্ত্তন করিয়া ভোগ্য বিষয়ের যোগ্য প্রয়োগের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅক্রুব ছিলেন পরম ভক্ত। তাহার ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহ বন্দনায় ভগবান সন্তুষ্ট হন। মারুতিনন্দন বজ্রাঙ্গী হনুমান দাস্য ভাবের পরমাদর্শ। শ্রীভগবান বাসুদেবের প্রিয সখা অর্জুন। আর অর্জুনের সখ্যে ভগবান্ বশ। শুধু বশ বলিলে মনের আশা মিটেনা। ভগবান তাহার আজ্ঞাকারী। দৈত্যরাজ বলিতো সর্ব্বস্ব সমর্পণের

বিনিময়ে ভগবান বামনদেবকে কিনিয়া লইলেন চিরদিনের মত। ইহাদের ভজনে ভগবান্ আত্মদান করিয়াছেন। তাই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলেছেন—

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ॥

যে কোনো একটি সাধনে কিরূপ সিদ্ধিলাভ হয় তার সম্বন্ধে একটি পুরাণো কথা বল্‌বার লোভ সামলাতে পারছি না। বহুদিন আগের কথা—সরল প্রাণ এক রজক। সে ময়লা কাপড় কাচে। পাটের উপর আছাড় দেয় আর 'সীতারাম' বলে। কোন এক সাধু তাকে বলেছিলেন—আরে পাগ্‌লা ভগবানের নাম উচ্চারণ করে কত পাপী-তাপী কত মলিন চিত্ত দুরাচার পবিত্র হয়ে গেল—তাদের প্রাণের ময়লা চিরকালের জন্য ধুয়ে গেল চলে। তোর কাপড়ের ময়লা ঠাকুরের নাম করে আছাড় দিলে থাকবে? নিশ্চয় যাবে। তুই প্রতি বারে 'সীতারাম' বলে কাপড় পরিষ্কার করিস্। মারুতি রজক সেই থেকে সত্যই বিশ্বাসের সঙ্গে সীতারাম নাম উচ্চারণ করে আর অনুভবও করে তার কাপড়গুলি অন্য সব রজকের চাইতে অল্পশ্রমে অধিক পরিষ্কার হয়ে উঠে। তার বন্ধুরা তার কাজ দেখে প্রশংসা করে। কেহ কেহ তার মত সীতারাম বলতেও শুরু করেছে। কিন্তু প্রতিপক্ষ দলটিও খুব মন্দ নয় তারা বলে, ঐটি মারুতির দল তৈরী করার ফন্দী ছাড়া আর কিছু নয় রে ভাই আর কিছু নয়। অনেকে অনেক কথা বলে। কিছুদিন এইভাবে কাটিয়া যায়।

একদিন সকালবেলা শয্যা ত্যাগ করে সে দেখে তার পাথাটি

নেই। তার স্ত্রী বলে চারদিকে চোরের উপদ্রব হয়তো গাধাটি কেউ চুরি করেই নিয়ে গেছে। মারুতির প্রধান সম্বল ঐ গাধাটি, তার পিঠে করেই সে কাপড় আনে নেয় দেয়। তবে কি গাধাটি গেল ? সে চুপ করিয়া থাকে আর মনে মনে স্মরণ করে সীতারাম। কিছুক্ষণ পরেই স্ত্রী বলে—বসে থাকলে চলে না। আজ যে ঘরে চাল ডাল তরিতরকারি কিছু নেই। সবই যে আন্‌তে হবে। মারুতি ভাবে তাইতো পয়সাতো হাতে নেই তবে কি হবে ? দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে ভাবে দরিদ্রের সবদিকেই দুর্ভোগ। সে মনে মনে সীতাবাম সীতারাম স্মরণ করে। এদিকে তার মেয়ের বাড়ী থেকে খবর এসেছে নাতির মুখে ভাত।

সেখানে যেতে হবে। কিছু ভেট তো নিতেই হবে। এখন এসব কি করে কি হয় ? মারুতি চঞ্চল হয়নি সে শুধু ভাবে সীতারাম, ভগবানের কি ইচ্ছা বুঝবার সাধ্য কার ? তিনি তাঁর ভক্তকে নিয়ে সব সময়ই খেলা করেন। আমরা অবোধ জীব তাঁর খেলার খবর আর কতটুকু রাখতে পারি। বুঝি রজকের নামনিষ্ঠা ছিল, তাই তার মুখের নামে তার কাচা কাপড়গুলি সহজে পরিষ্কার হয়। শুধু কি তাই—দেখা গেল হারানো গাধাটিকে তারই এক প্রতিবেশী টানিয়া আনিতেছে। সে বলে কোথায় ছিল এটা। প্রতিবেশী উত্তর দেয় এইতো দাসেদের বাগানে গিয়ে পড়েছিল। আমি দেখে নিয়ে এলুম। তোমারতো আর কোনো দিকে নজর নেই শুধু আছে সীতাবাম। চুপ করে থাকে মারুতি, আর মনে ভাবে "আহা তাই হক ভাই, তাই হক।" জমিদার বাড়ীতে আজ ছোট ছেলেদের "চূড়াকরণ" উৎসব অনেক লোক

খাবে। মারুতির ডাক পড়েছে। সেখানে সে না গেলে কোনো কাজ হচ্ছে না। ছেলেকে স্নান করাবার সময় নাপিত, রজক সব্বাইকে উপস্থিত থাক্‌তেই হবে। তাদের জন্য সব ধার্য্য করা আছে বৃত্তি। সে সিধেটা বড় কম নয় দশ সের চাল আর তার সঙ্গে তেলমশল্লা তরিতরকারিতো আছেই। নতুন কাপড়ও একখানা আছে। এগুলো মারুতি নিয়ে এলেই হয়। মারুতি ভাবে এসবই সীতারামের দান। তার মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। সে ধীর পদবিক্ষেপে জমিদার বাড়ীতে গিয়ে তার প্রাপ্যটা নিয়ে এসে স্ত্রীকে বলে সীতারামের অনুগ্রহে ঘোষেদের বাড়ীর পাওনা ছিল কটা টাকা পথে আসতে পাওয়া গেল। এবার চল বেয়াই-বাড়ী অন্নপ্রাশনে।

ঠাকুর বলেন—মারুতির রামনামে বিশ্বাস ছিল। তাই সে আর সব কিছু ফেলে সেই নামেরই আশ্রয় নিয়েছিল। আর লাভও তার হয়েছিল অপরিমেয়। নামের গুণে সে ইহলোক পরলোক সমান ভাবে জয় করেছিল।

বসু বাবুদের রাসের মেলা বসেছে। একমাস ধরে এই মেলায় নানাদিগ্‌দেশ হতে কত বাজীকর, কত গায়ক, আর কত তামাসার খেলোয়াড় সব এসেছে। এবারকার রাসের মেলার সব চাইতে বড় আকর্ষণ দীর্ঘকায় বিশাল জটাধারী গৌরবর্ণ সদা হাস্যবদন এক সন্ন্যাসী। ইনি কোন্ দেশের লোক পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তবে তিনি মৃদু মৃদু কথা বলেন. ভাঙ্গা হিন্দীতেই। সে কথা বড় মধুর, বড়ই উপদেশপূর্ণ। আমাদের কথকঠাকুর কিন্তু মেলা দেখবার জন্য বেড়িয়েছেন তার কয়েকটি অনুগত ভক্ত সঙ্গে—

অবশ্য তাদের বাড়ীর মেয়েরাও অনুসরণ করছিল। ঠাকুর এ দোকান ও দোকান করে দেখছেন—দোকানীরা এগিয়ে এসে প্রণাম করে, সসম্ভ্রমে একপাশে দাঁড়ায়, বিনীতভাবে প্রশ্ন করে—ঠাকুর কিছু দিব কি? ঠাকুর হেসে বলেন—আরে না, আমার আবার কি দরকার বল, সবই তো তোমরা প্রয়োজন মত দিয়ে থাক। সত্যই দোকানীদের অনেকেই ঠাকুরের গুণমুগ্ধ।

একটি পুরাণো ঘাটের ধারে বসে আছেন সাধুবাবা জানকীদাস। চতুষ্পার্শ্বে ভক্ত ও ভক্তাদের ভীড় আছেই। তারা কেবল কে কার আগে সাধুবাবার পদ স্পর্শ করবে এই নিয়ে চঞ্চল। এদের প্রণাম গ্রহণ করতে সাধুবাবাও চঞ্চল হয়ে পড়েন। তাঁর কথা কেউ শুন্‌বে, না, শুধু ছুটে এসে পায়ে পড়বে লুটিয়ে। কথক ঠাকুর ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হলেন। সাধুবাবা বলেন—আরে তোবা পথ ছেড়ে দেরে পথ ছেড়ে দে। ঐ দ্যাখ সাক্ষাৎ নারারণ এসেছে রে—সাক্ষাৎ নারায়ণ এসেছে। ঠাকুর এসে সন্ন্যাসী জানকীদাসকে অভিবাদন প্রণাম করতেই সাধুবাবা তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেতে লাগলেন, যেন কতদিনের পরিচয়। ঠাকুর বলেন—সাধুবাবা কতদূর থেকে আস্‌ছেন? তিনি বলেন শ্রীরঙ্গম্। শুনলাম, বাংলাদেশে খুব বেশী হরিনাম কীর্ত্তন হয়, তাই মনে হল, একবার শুনে আসি। এটাতো শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেশ এখানে তো ভক্ত থাক্‌বেই। তবে এদেশের লোকও যে মহাপ্রভুর ধর্ম-সাধনা না করে সন্ন্যাসী হয়, এটাই আমার বড় আশ্চর্য্য মনে হয়। আপনাকে দেখে তো আমার বড়ই ভাল লাগছে। আপনি নিশ্চয় গান গাইতে পারেন। আপনি কি

করেন? ধর্মোপদেশ—তা আপনাকে দেখে কিন্তু আমার সেই কথাই মনে হচ্ছিল। বেশ তো যদি মনে কিছু না করেন একটি গান শুনিই না।

ঠাকুর মধুর কণ্ঠে বিনীতভাবে বলেন—সাধু বাক্য লঙ্ঘন করা উচিত নয়। এটাও সাধুর সেবা শ্রীভগবানের নাম গান করা তা আবার সাধুর কাছে সে তো একটা মস্ত বড় সৌভাগ্যেরই কথা। সাধুবাবা যখন আজ্ঞা করেছেন একটা গান গাইতেই হবে।

হরিবোল বল জগাই মাধাই।
হরি নাম বিনে আর গতি নাই॥
হরি নামের গুণে হয়
ব্রহ্মার ব্রহ্ম ভাবোদয়
ও শিব ত্যজে কাশী শ্মশানবাসী
হলেন মৃত্যুঞ্জয়
মধুর বড় ছোট বড় (ঐ নাম) কারো বলতে বাধা নাই
হরি বোল বল জগাই মাধাই।

মধুর মধুর? ঠাকুর আপনার কণ্ঠে এ গানটি যে বড়ই মধুর। আমার মনে হচ্ছে এই নাম কীর্ত্তন যেন আমার প্রাণকে এক নতুন ভাবের রাজ্যে আকর্ষণ করছে। আবার গান করুন, আমিও আপনার সঙ্গে গান করি। ঠাকুর বলেন—সে অনেকদিন হল, তখন আমি গ্রামে গ্রামে নানাস্থানে কথকতা করি। আমার দুচারটি বন্ধু তাঁরাও গীতা ভাগবত আলোচনা কর্ব্বার জন্য আমার সঙ্গে থাকেন। তাদেরই একজন তিনি বেশ ধনীর ঘরের ছেলে আমার কাছে কিছুদিন গীতা পাঠ করেন। ক্রমে তার মনে

বৈরাগ্যভাবের উদয় হয়। আমার কাছ থেকে মাঝে মাঝে তিনি ছুটে যান একটি আশ্রমে, যোগী সাধকের কাছে যোগাভ্যাসের জন্য। প্রথম কিছুদিন ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন। এমন কি কিছু কিছু ঔষধপত্রও খেয়ে তিনি ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার জন্য উৎসুক, করেনও তাই। আমি সে কথা মোটেই জানতাম না। কিছুদিন পর তার উন্মাদের লক্ষণ দেখা দেয়। খোঁজ লইয়া তখন জানা যায় যে—উন্মাদের কারণ—তাহার যোগসাধনার পথে অনিয়ম ও ভুল পথে অগ্রসর হওয়ার ফল। চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। বড় বড় ডাক্তার আসিলেন, রোগীকে পরীক্ষা করিতে গেলেই সে আরো বেশী ক্ষেপিয়া যায়, আর বলে, আমার কোনো রোগ নাই। তোমরা আমাকে জ্বালাতন করিও না। আমাকে ধ্যান করিতে দাও, আমাকে নাম শুনিতে দাও, আমাকে নাম করিতে দাও। আত্মীয় স্বজন যতই তাহাকে ব্যবহারিক উপদেশ দেয়, ততই তাহার রোগ বৃদ্ধি হয়। এমন কি কখনো দেখা যায়, দমবন্ধ হইয়া আছে। রোগী মৃতের মত অসার হইয়া আছে, আবার কিছুক্ষণ পরেই সে উচ্চস্বরে নাম কীর্ত্তন করিতেছে। সে কেবল বলে—ঠাকুরকে ডাক। আমি যখন তাহার কাছে যাই, বেশ চুপ্ করিয়া আমার উপদেশ শুনে হাসিয়া কথা বলে। যেন কোনো রোগ তাহার নাই। এইভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে একদিন তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা বলতো তোমার অসুখের কারণটা কি? আমার কাছে বলিতে তো কোন সঙ্কোচের কারণ থাকিতে পারে না। বল, সত্যকরে, বল রোগের কারণ কি? তখন তাহার ব্রহ্মচর্য্য

পালনের গোপন প্রচেষ্টার কথা সে বলে, আর আমায় অনুরোধ করে, তুমি যদি প্রতিদিন আমার কাছে বসে প্রভুর নাম গান কর, তবেই আমি সুস্থ হই। তার কথায় রাজী হয়ে আমি প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় হরিনাম করিতাম। এই ভাবে দেখা গেল, সত্যসত্যই অল্পদিনের মধ্যেই সে সুস্থ হয়ে উঠ্‌ল। হরিনামের এমন প্রভাব আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আজও সেই বন্ধুটি আমার হরিনাম নিয়ে পরমানন্দে থাকেন।

রাসের মেলায় সাধুর কাছে বসে কথকঠাকুর আমাদের লক্ষ্য করে বহুপ্রকার উপদেশ দিয়েছিলেন সেদিন। সাধুর কি রকম সব প্রশ্ন হয়েছিল সবগুলি মনে নেই। তবে আমাদের ঠাকুর উত্তর দিতে গিয়ে যে সব কথা বলেন, সেগুলি কিছু কিছু মনে আছে।

তিনি বলেন—"কাম" "কাম" বলিয়া ডাকিলেও কামভাব আসেনা কিন্তু সুন্দরী স্ত্রীলোকের মুর্ত্তি চিন্তার মধ্যে আসিলেই সেই ভাব আসিতে পারে। ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিয়া ডাকিলে কি হইবে তাহার মধুররূপ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র নবীন মদনকে ভাবনা করিলে প্রাণে ভগবৎপ্রাপ্তির লালসা জাগিবে। পরমেশ্বর নিরাকার সাকার যে য বলে বলুক, কিন্তু তাহার সাকার রূপ ভাবনায়ই অধিকতর আনন্দ লাভ। একথা শাস্ত্রানুমোদিত।

মানুষ যদি নিজেকে জানিতে চাহিত সে পরমেশ্বরেরও খোঁজ পাইত। বুঝিত তাহার নিজের সত্ত্বা নিজের অধীন নয়। যাহার অধীন ভাবে তাকে চলিতে হয়, তিনিই পরমেশ্বর। যন্ত্র যেমন চেতন পুরুষের অপেক্ষা রাখে তাহার গতির জন্য, তেমনিই জীবের গতি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পরমেশ্বরের প্রয়োজন আছে। জড় জগতের

মধ্যে প্রকাশ, বৃদ্ধি, গতি ও ধ্বংসের প্রতিটি কার্য্যে পরমেশ্বরের নিয়ন্ত্রণ।

গাছটি যেমন বীজের মধ্যে অপ্রকাশিত থাকিলেও সম্ভাবনা-রূপে লুকাইয়া আছে ঠিক সেই ভাবে প্রতিটি নামের অক্ষরে ভগবান লুকাইয়া থাকিলেও নিত্যই নিশ্চিত আছেন। নাম-সাধনায় তাঁহার অনুভব হয়। তাঁহার অনুভব বিশ্বাসে। তাঁহার দর্শন প্রেমে। বিশ্বাস ও প্রেম ভিন্ন তাঁহাকে দেখিবে কে? দেখিয়াও বিশ্বাস হয় না। তিনি সর্ব্বরূপে চারিদিকে আছেন। প্রেমিক পুরুষ প্রেমে দেখেন, তিনিই সর্ব্বরূপে আমাদিগকে আপ্যায়িত করেন, সব সময়।

ভালবাসিতে থাক। এই ভালবাসা সার্থক হবে একদিন। পুকুরে সাঁতার শিখিয়া পরে নদীতে সাঁতার দেওয়া যায়। কাছে যারা আছে, তাহাদের যদি ভালবাসিতে পারিলে না, দূরে যে আছে তাহাকে কি করিয়া ভালবাসিবে? অতএব আমার কথা ভালবাসাটা প্রথম হইতেই চাই। বিল্বমঙ্গল ভালবাসিতেছিল—তাই তার ভালবাসার যখন মোড় ফিরিল তখন তাহাতে অপূর্ব্ব প্লাবন আসিল। কত নদ নদী সরোবর সাগর আছে চাতক মেঘের জল ভিন্ন অন্য কোন জল স্পর্শ করে না। তেমনি কত শত সহস্র প্রলোভন সাধকের কাছে আসে সাধক শ্রীগুরুদেবের দেওয়া নাম ভিন্ন অন্য কোনো বস্তু গ্রহণ করে না। বাজীকরেরা অনেক-রকম ভেল্কী দেখায়। বুদ্ধিমান লোক সেগুলিকে উপেক্ষা করিয়া গুরুর দেওয়া নাম মন্ত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীহরিনাম মন্ত্র প্রদান করেছেন কলিজীবের

একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধন বলে। যারা সেই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে না মানিয়া হরিনামের দোহাই দিতে চায়, তাহারা নিশ্চয় আত্মপ্রবঞ্চক। হরিনামের মহিমা হরিভক্তিবিলাসে সংগৃহীত আছে। সকল বেদ-শাস্ত্র হইতে অনেক কষ্ট করিয়া গোপালভট্ট, সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি এই সংগ্রহ করেছেন। তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিলে তাদের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ না করিলে মহতের অতিক্রম হয়। আমার কথা হল এই—যাহারা হরিনাম করেন বা করিবেন তাহারা যেন শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে দেখিয়া হরিনাম করেন।

ঠাকুর যাবেন বৃন্দাবন। গ্রামশুদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলেই বলে—আমায় যদি ঠাকুর আদেশ করেন আমারও তীর্থ দর্শন হয়ে যায়। আপনার সঙ্গে যাওয়া সেতো একটা মহাভাগ্যের কথা। ঠাকুর ভাবেন তাইত বৃন্দাবন দূরের পথ। অতগুলো লোক সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া সেটাও একটা মস্তবড় ঝঞ্ঝাট।

তিনি বলেন—দেখ, তোমরা যাবে সেতো খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু জানোতো আমি কখন কোন্ বাতাসে কোথায় চলে যাই তার কোনো স্থিরতা নেই। তাই ভাবি তোমরা আমার সঙ্গে গেলে তোমাদের দর্শনের নানারূপ অসুবিধা হবে, সেইটে ভেবে দেখ। ঠাকুরের ঐরূপ উদাসীনভাবের কথা শুনেতো কতক লোক ঠিক করলে তাদের আর এ যাত্রা যাওয়া হলো না। তারপর যারা শেষ পর্যন্ত যাবার জন্য নিতান্তই ঝুঁকে পড়ল, তাদের সংখ্যাও বড় কম নয়। বেশ একটি বড় দলই হল। ভাল দিন দেখে ঠাকুরকে নিয়ে তারা রওনা হল। তখন ঠাকুরের গলায় বেলফুলের গোড়ে মালা আর ললাটে চন্দন। আসে পাশে

গ্রামের লোকেরা বান্ধবেরা। মোট ঘাট নিয়ে চলেছে ঠাকুরের সেবকেরা। স্ত্রীলোকগণ দলে দলে অগ্রসর হচ্ছে ঠাকুরের আদেশে। ষ্টীমার ষ্টেশনটি আবার একটু দূরে। তাই ঠাকুর প্রথমেই মেয়েদের রওনা করে দিয়েছেন, যাতে তারা আগেই গিয়ে ঘাটে পৌঁছায়।

ভোঁ শব্দ করে ষ্টীমার এসে পড়ল। ছুটাছুটি করে মালপত্র তুলে দিয়ে ঠাকুরকে ভাল করে বসিয়ে আর চারিদিকে কোনোমতে স্থান করে নিয়ে সবাই বসে। সবারই নজর ঠাকুরের যেন কোনো অসুবিধে না হয়। আর সব যাত্রীরা এই দলটিকে দেখে স্তব্ধ হয়ে থাকে, আর ভাবে এই ব্যক্তি খুব বড় সাধু হবে। যার সঙ্গে যত বেশী লোক সে-ই তো তত বড় সাধু। আগেকার দিনে ছিল সাধু হলেই বনে নির্জনে একাকী চলে যেতো। আর আজকাল জনগণের কল্যাণের জন্য সাধুরা সব দলে দলে লোক সংগ্রহ করে সহরে বা গ্রামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এর সঙ্গে অত সব ভক্ত স্ত্রী পুরুষ আর কি সুন্দর মূর্ত্তি। আগেকার সাধুরা স্ত্রী দর্শন স্ত্রী স্পর্শন বিষের মত ত্যাগ করতো। এখন দেখছি সাধুরা স্ত্রীলোকদেরই বিশেষ করে প্রাধান্য দেন তাদের দলের মধ্যে। তাদের সেবাটাই খুব আদরণীয় হয়। কিন্তু এ কেমন সাধু রঙ্গীন বস্ত্র তো নয়। বৈরাগীর ডোর কৌপীনও তো নয়। এ যে বেশ শান্তিপুরের তাঁতের কাপড়, সিল্কের জামা গায়ে, জুতো পায়ে। তা গলায় মালাটির সঙ্গে গরদের চাদরখানা ঝুলছে বটে। ওটা বেশ ফিকে হলদে রংএর। মনে হয়, সখ করে চাদরখানাকে

একটু হল্‌দে রংএ ছোবানো হয়েছে। বেশ তো সাধু। এমন জামা জুতো আর পাউডার স্নো মেখেও যদি সাধুর পূজা পাওয়া যায় মন্দ কি ? ধন্য কলি যুগ। এ যুগে আর বাকী কিছু রইল না। হুঁ এতক্ষণে বুঝলুম। সাধুটি সংসারত্যাগী নন, গৃহী। আহা সেই অভাগিনী সাধু পত্নীটি হয়তো গৃহের কোণে ছেলেপুলে নিয়ে মানুষ করতেই হয়রাণ হচ্ছে আর দেখ সাজা সাধুটির বাহার কত ! তিনি চলেছেন তীর্থ করতে। আরে মর, তীর্থে যদি মন তো সস্ত্রীক যাওয়াইতো বিধান। স্ত্রীকে ঘরের এক কোণে ফেলে রেখে আর একদল লোক নিয়ে সাধু সেজে দেশে দেশে ছুটাছুটির কি ফল হয়, তাতো আমি বুঝি না। হ্যা এখন গৃহীরাও সব বড় বড় সাধু হয়েছেন শুনতে পাই। কালে কালে কতই হচ্ছে--সেদিন শুনলুম, এক সাধু স্বপ্নে দর্শন দিয়ে তার শিষ্যাকে বিনা সাধনেই সিদ্ধ করে দিয়েছেন। হবে না কেন, সাধুরা সবই করতে পারেন। ইনিও বুঝি ঐ রকম ঘরে থেকেই সাধু হওয়ার রেওযাজ করছেন। তা এখন তো দেখা যায়, নামে সন্ন্যাসী হয়েও ডুদশটি শিষ্যা সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়ান আর ভস্মের ব্যবহার ছেড়ে দিয়ে সেণ্ডেল পাউডার আর স্নো মাখতে শুরু করেছেন। তথাকথিত ত্যাগীরাই যদি এভাবে চলেন ইনি তো গৃহীই। এর সম্বন্ধে আর কি বলা যায়। যাই দেখি সাধুটির পরিচয় লওয়া যাক্।

সাধুটির বয়স খুব বেশী হয়নি। বেশ সদালাপী। আমাকে দেখেই বুঝেছেন, আমি তার কথা জানতে চাই। তিনি খুব পরিচিতের মত আমায় ডেকে কাছে বসালেন। তারপর তিনি বলতে শুরু করলেন—তার জীবনের কথা। রায় মশায়, সাধুজীবন

যাপন করা খুব কঠিন। আপনারা অনেক সময় আশা করেন, সাধু হবে সব বিষয়ে নিস্পৃহ, আর স্বাভাবিক জীবন বন্ধন হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন। তার কোনো বন্ধু বান্ধব থাকবে না। তার আহার বিহারের ব্যবস্থা থাকবে না। সে হবে সর্ব্বহারা, অসামাজিক এক অদ্ভুত জীব। আমি কিন্তু আপনাদের সেই ভাবের সাধু নই। আর কোনদিন যে হতে পারবো সে ভরসাও নেই। মানুষের ভেতর দেবতা ও পশু উভয় ভাবই আছে। সব সময় মানুষ পশুও নয়, আর দেবতাও নয়। যখন তার পশুভাব চাপা পড়ে যায়, আর দেবভাব ফুটে ওঠে, তখনই তাকে সাধু বলা হয়। সাধু হলে তার চারটে হাত হয় না, বা তার শিং গজায় না। ভাবের শোধন হলেই সাধু। কাম কামনার ভাবনায় জীবন যাপনই অসাধু ব্যবহার।

ভক্তিময় জীবনই সাধু জীবন। ভক্তির অধিকার সকলের। কোনো বাধা ভক্তিকে অভিভূত করে না। শুদ্ধ কামনা রহিত হলে তো কথাই নেই, কামনা কলুষিত চিত্তেও হরির আরাধনায় বাধা পড়েনা। বরং ভক্তি হৃদয়ে প্রবেশ ক'রে প্রাণের মলিনতা দূর করে দেয়। তবে ভাগ্যক্রমে ভক্তিটি তীব্র হলেই হয়। ভগবানের শক্তি ব'লেই ভক্তির পথে বাধা হয় না। যারা ভক্তি করেন ভগবানের অনুগ্রহে তারা অনির্ব্বচনীয় একটা তৃপ্তি অনুভব করেন। এটাকে সুখও বলা যায়। কাজেই দুঃখের সময় ভক্তিতেতো আগ্রহ হয়ই সুখের সময়ও ভক্তিদ্বারা প্রাণের তৃপ্তি লাভ হয়। মহাভারতের কথায়—

ভক্তক্ষণঃ ক্ষণোবিষ্ণোঃ স্মৃতিঃ সেবা স্ববেশ্মনি।
স্বভোগ্যস্যার্পণং দানং ফলমিন্দ্রাদি দুর্লভম্॥

ভক্তের আনন্দেই বিষ্ণুর আনন্দ। ভক্ত গৃহে অবস্থান ক'রে বিষ্ণু স্মরণ করেন, উহাই তাঁর সেবা। নিজের ভোগ্য সামগ্রী ভগবান বিষ্ণুকে অর্পণ করেন, উহাই দানধর্ম্ম। এ ভাবেই ভক্ত দেবতার দুর্লভ ফল লাভ করেন।

সকাম ভক্তিও শেষ পর্য্যন্ত শুদ্ধ ভক্তিতে পরিণতি লাভ করে—ভগবানের করুণায়। শুনেছেন তো শ্রীচরিতামৃতের বর্ণনা—

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এতো বড় মুর্খ॥
আমি বিজ্ঞ এই মুর্খে বিষয় কেন দিব?
স্বচরণামৃত দানে বিষয় ভুলাইব॥

যাঁরা ভগবানের আরাধনা করে না, অন্য দেবতার পূজায় নানারূপ কামনার দাবী জানায়, তারাও ভক্তের সঙ্গ হলে কাম কামনা ত্যাগ করার মত সাহস অর্জন করে। ভক্তসঙ্গ জীবনে পরশমণি ছোঁয়ার মত অচিন্ত্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে দেয়। আমি কিন্তু পণ্ডিতদের কাছে খুব বড় বড় কথা শোনার চাইতেও ভক্তদের কাছে বসে তাদের দৈন্যের কথা, দুঃখের কথা, তাদের কাতরতার কথা শুনতে ভালবাসি।

কিছুদিন আগে এক সাধুর সঙ্গে দেখা হলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা বলুনতো, আপনার যে এই সেবা-ধর্ম

এটা আপনি কোথায় কি ভাবে শিক্ষা করেছেন। তিনি কিন্তু আমার প্রশ্নে খুবই হেসে উঠলেন। তিনি বলেন, এই ভাবের প্রশ্নতো কেউ আমায় কখনো করেনি। মানুষ সেবা করে, এটা তার স্বভাবধর্ম্ম। তার আবার শিক্ষা কি আর কার কাছেই বা শিক্ষা করবে। আপনার প্রশ্নটির মর্ম্ম আমি বুঝতে পারিনি। আমি বলি—আপনি ঠিক বুঝেছেন, তবে বলতে চাচ্ছেন না। খুব আগ্রহ জানালে তিনি বলেন দেখুন, আমার প্রথম বয়স থেকে আমি ভালবাসার কাঙাল। খুব অল্পবয়সে আমার মা পরলোক গমন করেন। তদবধি আমি দূর সম্পর্কীয়া এক মাসীর কাছে পালিত। যখন আমার আত্মসম্মান বোধ হল, তখন বেশ বুঝতে পারলুম আমার তাদের সংসারে গলগ্রহ হয়ে থাকাটা আর কোনো-মতে বাঞ্ছনীয় নয়। আমি ভাগ্যান্বেষণে বের হলাম। কিছুদিন এক ধনীর গৃহে কাজ করে কিছু অর্থও সঞ্চয় করলাম। এই অল্প সঞ্চয় এক আত্মীয়ের কাছে গচ্ছিত রাখার ফল দাঁড়াল, আমার নতুন করে আঘাতের বেদনা অনুভব। আত্মীয়টি আমাকে বঞ্চনা করলেন। একদিন তিনি বলেন—তোমার কোনো সম্বন্ধ আমি রাখতে চাইনা। এ বাড়ীতে আর কখনো তুমি এসো না। এই আকস্মিক দুর্ব্যবহারে আমার মন ভেঙ্গে পড়ল। আমি এসে দাঁড়ালাম রাস্তার ওপর। ঠিক এই সময় একটি লোক আমার ভাগ্যে জুটে গেল। তিনি হলেন এক বিরাট ধনীর কর্ম্মচারী। মনীবের সন্তোষ বিধান করে বেশ জায়গা জমি করেছে, কিছু পয়সাও হাতে আছে। তার নাম রামেশ্বর কুণ্ডু। তিনি বলেন আমার একটা দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করবার ইচ্ছা কিন্তু

একটি স্বার্থশূন্য সেবা ধর্ম্মী লোক খুঁজে পাচ্ছিনা, যার হাতে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে এই কাজটির ভার সমর্পণ করতে পারি। কুঞ্জলাল, তোমার তো সংসারের কোনো টান নেই বল্‌লেই হয়। তুমি এ কাজটার ভার গ্রহণ করলে কেমন হয়?

আমি হাতে চাঁদ ধরায় আনন্দ অনুভব করলাম। রামেশ্বর বাবুকে বলে আমি সেই দাতব্য চিকিৎসালয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলুম। কিছুদিনের মধ্যে ঘর হল, বেড্ হল, চিকিৎসক নিযুক্ত হল। প্রসূতি সদন হল। সর্ব্বসাধারণের আগ্রহ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যে কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কোনটার আর অভাব রইল না। এই চিকিৎসালয় হল আমার সেবার মন্দির। অনেক দিন ধরে এই মন্দিরের সেবায় আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করেছি। কিন্তু একদিন মনে হল, শরীরতো বিনষ্ট হবেই। আর এই শরীরের সেবা করে দেখলুমতো একটার পর একটা ব্যাধিতো লেগেই আছে। এমন মানুষ খুবই কম যার কোনো না কোনো ব্যাধি আছে। এই ব্যাধি মন্দিরের সেবার উপর চিরশুদ্ধ চিণ্ময় রসঘন বিগ্রহের সেবাতো জীবনে করা হয়নি। এবার আমি সেই আনন্দ মন্দিরের সেবা করবো। তাই ঐ সব কাজের ভার একটি উৎসাহী যুবক বন্ধুর উপর দিয়ে আমি পালিয়ে এলাম শ্রীবৃন্দাবন। এখানে এসেও দেখি আমার অধ্যাত্ম চিন্তার চাইতে সাধু বৈষ্ণবগণের নির্বিঘ্ন ভজনের সহায়তা করার প্রয়োজনীয়তা বেশী। আমার প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠল সাধুদের অসুবিধা দেখে। যারা জীবনের কর্ম্ম প্রবাহ হতে অতি দূরে আছেন, তাদের খাওয়া পরার কোনো ব্যবস্থা নেই। সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন তাদের মুখে প্রসাদ তুলে

দেওয়া। তাদের বাসস্থানের নেই কোনো স্থিরতা। এই বিষয়ে একটি ভাল ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

আমি কিন্তু কপর্দ্দকহীন, অথচ প্রাণে সেবার জন্য অদম্য লালসা। সাধুদের কাছে বসি, এই সব কথা বলি। আমার পরম শ্রদ্ধার পাত্র এক নিষ্কিঞ্চন সাধু আমার প্রাণের সংশয় মিটিয়ে দিয়ে এক-দিন বলেন—বাবা কুঞ্জলাল, তুমিতো আর সকলের কিসে সুখ হবে তাদের আহার বাসস্থানের কথা খুবই ভাবছ। একদিন তুমি নিজের কথাটা ভাবতো? তুমি কোথা থেকে এলে এই মাটির জগতে? কি তোমার কর্ত্তব্য, এই মানুষ শরীরে? তোমার নিশ্চিত মৃত্যু যখন আসবে তখন তুমি কার সহায়তা প্রার্থনা করবে। এই জীবনের আলো যখন শেষ হবে, তখন কোথায় তুমি যাবে? প্রাণতো মরে না। আত্মা নিত্য। তার গতি সম্বন্ধে কোনোদিন ভেবে দেখছ কি? আমি বলি, সত্যই তো বাবাজী ঠাকুর, আমি এ সব বিষয়ে কখনো তো চিন্তা করবার অবসর পাইনি। তবে আমাকে আপনি অনুগ্রহ করে এ বিষয়ে একটু উপদেশ করুন।

সাধুর অনুগ্রহে আমার মন উঠে এল সংসারের জটিলতা থেকে। এখন আমার মন শুধু ঘুরে বেড়ায় পরমানন্দময়ের আনন্দ লীলার সন্ধানে। আমার মাঝে আমি খুঁজে পেয়েছি অনন্ত জীবন। সেবাময় জীবন—সে সেবা জড় জগতের লৌকিক সেবার বহু উর্দ্ধে। পরম সত্য সুন্দরের সেবা। যে সেবা অফুরন্ত প্রাণের উচ্ছলতায় নিত্য নব নব আনন্দের তরঙ্গের সঙ্গে পরিচিত করে।

ঠাকুর বল্লেন—মানুষের জীবনে সাধুসঙ্গ অভাবনীয় পরিবর্তন

এনে দেয়, কুঞ্জলাল আর এখন সাধারণ শ্রেণীর লোক নয়। তার জীবন এখন মধুময় সে এখন সত্য প্রেমিক সাধু।

ঠাকুরের কথায় তৃপ্তিলাভ করে রায় মহাশয় আরো কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, আপনাদের আশ্রম কোথায় ? আপনারা কোথায় যাবেন জানতে পারি কি ? ঠাকুরের শিষ্য রামবাবু বলেন—একে আপনারা জানেন না, ইনি যে আমাদের 'কথক ঠাকুর। ইনি কখনো নিজেকে সাধু বলে জাহির করেন না। এর মহিমা আজ আমাদের সকলকে আকর্ষণ করেছে এঁর পদতলে। ইনি আমাদের মা বাপ, যা বলেন, বলুন। এঁর কথায় অমৃতের ধারা, এঁর কথায় আমাদের হৃদয়েব দ্বার খুলে যায়। এঁর কাছে এসে তীর্থস্নানের পবিত্রতা লাভ করি। ইনি যে কি মন্ত্র জানেন সে কথা বলার অধিকার আমার নেই। তবে এটুকু বল্‌তে আমার কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় না যে, ইনি তাঁর শিক্ষা দিয়ে আমাদের সমাজের গ্রামের অনেক উন্নতি বিধান করেছেন ও করছেন। জনশিক্ষার জন্য সব সময় এঁর চিন্তা। কি ভাবে অতি সাধারণ নিরক্ষর লোকের মনেও সমাজচেতনার উদয় হয় পরস্পর মিলে মিশে কাজ করে, কি উপায়ে সমাজের উন্নতি করা যায়, যারা অল্প শিক্ষিত তারাও কি ভাবে উন্নততর শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, যারা নিরক্ষর কি ভাবে তাদের নিরক্ষরতা দূর করা যায়, কি ভাবে মানুষ পরের উপকার করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইতে পারে, এ সব বিষয়ে এঁর সব সময় দৃষ্টি।

জিজ্ঞাসু রায় মহাশয় কথা শুনে চুপ্‌ করে রইলেন। তিনি বলেন—আপনি তো এই ঠাকুরের ভক্ত বলেই মনে হচ্ছে।

আপনিও তো এর সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে যাচ্ছেন। কতদূর আপনারা যাবেন, আমিও মথুরা হয়ে বৃন্দাবন যাব মনে করেছি। তা আপনাদের মত সৎসঙ্গে যদি যাওয়া যায় মন্দ হয় না। আমাকেও আপনাদের দলভুক্ত করে নিতে কোন আপত্তি আছে কি? অমনি উত্তর হলো বাঃ এতো ভারী মজার কথা বল্‌ছেন। আপনি বৃন্দাবন যাবার জন্য প্রস্তুত আর আমরাও বৃন্দাবনেইতো যাচ্ছি। আপনি যাবেন তা আপনাকে সেই গাড়ীতে আমাদের দলভুক্ত করা আর না করা কি? যাবেন সে তো ভালই। এক গাড়ীতেই চলুন। পথে আমাদের ঠাকুরের অনেক কথাই শুনতে পাবেন।

হাওড়া থেকে তুফান মেল ছুট্‌ল সেদিন শুভক্ষণে। গাড়ী চলেছে কীর্ত্তনও চলেছে অবিশ্রান্ত ভাবে। কি যে আনন্দ তরঙ্গ তা আর বলে প্রকাশ করবার নয়। ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়ায় মুহুর্ত্তের মধ্যে শত শত লোকের ভীড় আমাদের গাড়ীর সম্মুখে। আর সকলেরই উৎসুক দৃষ্টি খুঁজে বেড়ায় এই নামের কলরোলের মাঝখানে আমাদের প্রিয় সাধু ঠাকুরজীকে। তিনি তো আর সহজে ধরা পড়বেন না। অতি সাধারণভাবে একটি কোণে তিনি বসে থাকেন। যেন কারুর সঙ্গে তার পরিচয় নেই। ঠিক এমন করেই তিনি আত্মস্থ হয়ে চলেছেন তীর্থের পথে।

যদি কেউ কাছে গিয়ে একটু জল একটু ফলের রস একটু খাবার নিয়ে তাগিদ দেয় কিছু গ্রহণ করতে ঠাকুর শুধু মাথা নেড়ে অসম্মতি জানান। তিনি কিছু খাবেন না গাড়ীতে। কখনো বা বলেন—তোমরা খেয়ে নাও। সুবিধামত আমি যা হয় করে নেবো।

সন্ধ্যার সময় আরতি গান আরম্ভ হল। ঠাকুর, হাতে জপের মালা, প্রসন্ন বদনে সম্মুখে বসেছেন। যেন সাক্ষাৎ ধ্যান মূর্ত্তি প্রজ্ঞান দেব। ধীরে ধীরে তাঁর ভাব প্রকাশ হয়ে যেন তাঁকে কোন্ প্রেমরাজ্যে নিয়ে গেছে। অবিরলধারায় তাঁর দুই গণ্ড অভিষিক্ত, নয়ন নিমীলিত। বিশুদ্ধ সম্বিৎ মুখের শোভায় প্রকাশিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস গোপন করবার অত্যাধিক প্রচেষ্টার ফল ঘন ঘন শ্বাস। মুখমণ্ডল আরক্ত। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। তিনি বলেন—ওই ওই আসে আসে গোধূলির ধূলিমাখা বাঁকানয়ন নন্দ নন্দন নয়ন অভিরাম বলরামের সঙ্গে আসে আসে।

দেখ দেখ, তোমরা কি দেখিতেছ না? এই যে ধূলিতে গগন আচ্ছন্ন, অঙ্গগন্ধে বাতাস সুগন্ধি! ঐ যে বংশী গানে দিক্‌সমূহ মুখরিত, নূপুরধ্বনির মধুরতা শ্রবণের কি আনন্দ! আহা হা কি আনন্দ শ্রীদাম সুদাম বসুদাম সুবল মধুমঙ্গল প্রিয়সখা নেচে নেচে আসে। আগে আগে গাভীগুলি পুচ্ছ উচ্চ করে শিঙ্গাধ্বনির সঙ্গে তাদের স্ব স্ব গৃহাভিমুখে। কি তাদের উল্লাস, সারাদিন বলরাম আর শ্রীকৃষ্ণের লালনে তাদের বল দ্বিগুণিত হয়েছে। দেহে শক্তি, মনে আনন্দ, তাই তারা সন্ধ্যায় উল্লসিত হয়ে গৃহের দিকে ছুটে চলেছে। নয়নে ধেনুর পাছে রাখাল সঙ্গে দুটি ভাই নীলাম্বর পীতাম্বর নীলকমল শ্বেতশতদল হাস্যমকরন্দ দানকরে দর্শকের নয়ন সফল করছেন। কত দূরগ্রামের স্ত্রী পুরুষ ছুটে এসে এই পথের ধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে—শুধু কৃষ্ণমুখকমল দর্শনের লালসায়। তারা এসেছেন কত উপহার দ্রব্য সঙ্গে করে। কেউ এনেছে ফুলের মালা, আর কেউ এনেছে ফুলভরা ডালা।

মালা শ্যামের গলায় দেবে আর ফুলগুলো অঞ্জলি ভরে বর্ষণ করবে তাঁর সর্ব্বাঙ্গে। ফুলের মত তাদের মন সুন্দরশ্যামের অঙ্গস্পর্শ পাবে। ধন্য তাদের প্রেমপিপাসা। আরো সব এসেছেন রত্নথালায় মঙ্গল দ্রব্য সুসজ্জিত করে। ঐ দেখ, ঘৃত কর্পূরযুক্ত প্রদীপ সাজায়ে শঙ্খ, কদলী, অক্ষত, দুর্ব্বা, স্বস্তিক প্রভৃতি কত দ্রব্য নিয়ে তারা এসেছেন গোপালকে প্রাণের আদর জানাতে।

ঠাকুরের কথা শেষ হতে না হতে হতেই এক বর্ষীয়সী নারী একটি থালায় করে প্রদীপ জ্বালিয়ে ঠাকুরের সামনে এসে হাজির। তার ইচ্ছে ঠাকুরকে আরতি কর্বেন। যেমন মা তার মেয়েটিও তেমন। সেও এসেছে মায়ের পিছু পিছু এক ছড়া সুন্দর মালা হাতে করে ঠাকুরের গলায় দেবে বলে। ঘোষজায়া খুবই উল্লাসে ঠাকুরের সম্মুখে থালা নিয়ে বেশ কতক্ষণ আরতি করছেন। আর সব সঙ্গী ও সঙ্গিনীরা মিলিত কণ্ঠে 'জয় রাধা গোবিন্দ' নাম করছে উচ্চস্বরে। মালতী কিন্তু ধীরে অগ্রসর হয়ে অতি সন্তর্পণে গলায় মালাটি পরিয়ে দিচ্ছিল। ঠাকুরের মগ্নতা যেন ক্ষণেকের মধ্যেই ভেঙ্গে গেল। চোখ চেয়ে ঠাকুর বলেন ভারীকণ্ঠে—মালতী, নিজের জায়গায় গিয়ে বস। আমি এখন মালা গলায় পরব না। তোমাদের একটুও জ্ঞান হল না। দেখছ না আমি একটু শ্রীগোবিন্দ গোপালের ভাবনা করছিলাম আর অমনি তোমরা যে যার হট্টগোল করে আমার সেই আনন্দটা ভেঙ্গে দিলে। আচ্ছা, তোমরা কি আমায় নিজের মনে আনন্দ ভোগের অবসরও দেবে না? কথাগুলি অবশ্য মালতীর মালা সম্বন্ধে নয়। কেননা, ঠাকুর মালতীর দিকে যে ভাবে দৃষ্টিপাত করে কথাগুলি বলছিলেন

মালতী তা বেশ বুঝছিল আর মৃদু হাস্‌ছিল। কথাগুলি হ'ল মায়ের আরতি নিয়ে। ঠাকুর চান যে লোকের সামনে তাকে কেউ পাষাণ দেবতার মত পূজা না করে। তিনি অনেক সময় বলেন—দেখ মানুষের বহু ভুল ভ্রান্তি আছে। তার দুর্বলতা আছে। অভাব অভিযোগ আছে। দেবতা সহসা কোন কথা বলে না। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা জানায় না। অভাব দুঃখ কোন ভাল মন্দ প্রকাশ করে না, তাই দেবতা ভাল। আর তার কাছে সকলে নিজের নিজের চাহিদা জানায়, সুখী হয়। যার চাহিদা মিটে যায় সে তো দেবতার একান্ত ভক্ত হয়ে যায়ই আর তা যার হয় না সে ও অপেক্ষা করে থাকে—একদিন আশা পূর্ণ হবেই। মানুষ সে যতই বড়াই করুক সে কারো প্রাণের চাহিদা- পূর্ণরূপে মেটাতে পারে না। তার কারণ সে ও যে লোকের করুণা ভিখারী। এক ভিক্ষুক অপরের ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করে কেমন করে? মানুষ মিথ্যা আশ্বাস দেয় অনেক কিছু।

যদি কারুর কোন আশা পূর্ণ হয়, জানবে সেটি ভগবানের অনুগ্রহে। মানুষ দেবতার দর্শনের গর্ব্ব করে করুক। যে দেখে সে ব'লে বেড়ায় না—আমি ভগবানকে দেখেছি। অসুরেরা দৈত্যেরা যেমন হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি তারাও বলেছে—আমিই জগদীশ্বর, আমি ছাড়া আবার পরম ঈশ্বর কে? কিন্তু সত্য করে যখন ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন, তখন কে জীব আর কে ঈশ্বর তার পরিচয় পাওয়া গেছে। যে মুক্তির জন্য সাধনা করে সে জীব, আর যে মুক্তি দান করে সে-ই ঈশ্বর। জীব মুক্তি দাতা নয়। মুক্তি তার প্রার্থনীয়। মুক্তিদাতা গোবিন্দ।

তিনি জীবের উপাস্য। সেই উপাস্য ভগবানের সঙ্গে যে নিজেকে সমান বলে মনে করে, তার মন যে অভিমানে পূর্ণ সে কথা কি বলে বুঝাতে হবে? ঠাকুর বলেন—তোমরা সবাই আমায় ভক্তি কর, বিশ্বাস কর। আমাকে ঈশ্বর বলে যেন অপরাধী করো না। আমার ভাবনার ধারা ছিন্ন করো না। পূজা ধর্ম্ম কর, ঈশ্বর ভাবে নয়। আমি যদি আজ বলি 'আমি ভগবানের অবতার'। তা হ'লে যে আরো দশজনে অনুগত ভক্তদের কাছে বলে বেড়াবে 'আমিও ভগবানের অবতার'। এইভাবে যে সাধনার জগতে একটা বিপুল বিপর্য্যয় দেখা দেবে।

ঘরে ঘরে অবতার হ'লে কে আর ভক্ত হবে? সাধুরা লোক সংগ্রহের জন্য অনেক ক্ষেত্রে বিভূতি প্রকাশ করেন। আমি দেখেছি একবার এক সাধু বর্ষণোন্মুখ মেঘকে হাত তুলে রুখে দিয়েছেন। শুনেছি এক সাধু তাঁর ঠাকুরকে প্রখর রৌদ্রে ফেলে রেখে বৃষ্টিকে ডেকে এনে দশজনের উপকার করেছেন। এক সাধু অল্প খাদ্য দিয়ে বহু লোকের ভোজন সমাধান করেছেন। অপর এক বন্ধু নিজের আশ্রমে থেকে তাঁর অভিলষিত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দর্শন দিয়েছেন। শুনেছি এক মহাপুরুষ রুদ্ধ কক্ষের মধ্যে দর্শকের অগোচরে প্রবেশ করেছেন তার স্থূলদেহ নিয়েই। রোগ সারানোর কথাতো শুনে শুনে কান ঝালাপালা। এই সব শক্তি দেখানোর জন্যই কেহ কেহ ভগবান হয়ে গেছেন, তা যেন মনে করো না। এই ধরণের শক্তি মাঝে মাঝে ভক্ত সাধুদের হয়ে যায় অমনি। তার জন্য আলাদা কোন সাধনা তাদের কর্ত্তে হয় না। একবার আমাদের মাঝখানে এক জ্যোতিষী এসেছিলেন। তিনি

অনেকের মনের কথা বলে দিতেন। লোকে মনে করলো বুঝি তিনি খুব মস্ত বড় এক সাধু।

আমি কিন্তু তার এই বিদ্যার মূলটি কোথায় অনুসন্ধিৎসু হয়ে রইলাম। তাকে খাইয়ে দাইয়ে অর্থ সংগ্রহ করে দিয়ে খাতির করে নিজের কাছে কয়েক দিন রাখলুম। একদিন তাকে খুব নির্জনে জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা দাদা, এইসব লোকের মনের কথা আপনি কি করে বলে দিচ্ছেন, সেটাতো বুঝতে পারছি না। এ বিদ্যাটা যে আপনার জ্যোতিষী নয়, তা কিন্তু বেশ টের পেয়েছি। তিনি বলেন, আরে ভাই সবটাই কি আর জ্যোতিষ বিদ্যায় চলে? সঙ্গে সঙ্গে কিছু অনুমান, কিছু চতুরতা, আর কিছু বহুদর্শিতার ফল। তা ছাড়া আমি একটি মন্ত্র জপ করে সিদ্ধিলাভ করেছি। মন্ত্রটি —কর্ণ পিশাচী মন্ত্র। সেই মন্ত্রের শক্তিতে আকৃষ্ট কর্ণপিশাচী এসে আমার প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে বলে দেয়। শুনে তো আমি অবাক্ হয়ে গেলুম। অর্থ উপার্জনের জন্য আবার কর্ণ-পিশাচী মন্ত্র জপ করে সিদ্ধি লাভ? আমাদেরই এক পরিচিত পণ্ডিত তান্ত্রিক তাঁকেও দেখেছি। একদিন আমার সঙ্গে কথা হতে হতে যখন তিনি বুঝতে পেরেছেন আর চলে না, তখন আমার হাত চেপে ধরে যেন কি মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন অস্ফুট ভাবে। আমার মনে হলো আমার মুখ বন্ধ কর্ব্বার জন্য যেন বগলা মুখীর মন্ত্রই জপ করছিলেন। এই ব্যক্তির যে বশীকরণ শক্তি আছে তা আমি জানতাম, আর আমিও সে জন্য পূর্ব্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। সে দিন আর তার বড় সুবিধা হল না আমার কাছে।

সে অনেক দিন আগেকার কথা এক তান্ত্রিক সাধককে একবার

দেখেছিলাম। তিনি মাতৃসাধক শান্তস্বভাব নির্লোভ পবিত্রচিত্ত। তার কাছে আমি বেশ কিছু দিন প্রীতিলাভ করেছিলাম। তিনি গান গাইতেন খুব মধুর কণ্ঠে আবেগ-ভরে, স্বরচিত গান। সেই গানের সঙ্গে নিজেও তন্ময় হয়ে যেতেন—যারা শুনতেন তাদের তো আর কথাই নেই। একদিন আমি তাকে বলি সাধু তোমার ভাব তুমিই বোঝ আমাদের আর কিছু বুঝালে না। একবার একটু দেখাও না তোমার মা কেমন? সাধু বলেন, সে কি আর আমার সাধ্যি যে আপনাকে মাকে দেখাই। তবে মা যদি নিজে দেখা দেন সে কথা আমি কি বলব বলুন। আমি তো একটা অলৌকিক কিছু দেখব বলে একেবারে কৃত নিশ্চয়। কিছুক্ষণ বলাবলির পর তিনি আমাকে টেনে তার খুব কাছে প্রায় কোলের উপর নিয়েই বসলেন, মধুর কণ্ঠে গান আরম্ভ হল। একটি গান শেষ হ'তে না হতে আবার আরো একটি গান। এইভাবে তিন চারটি গান হলো। আমি কিন্তু সাধুর বুকের উপরেই হেলান দিয়ে আছি আর বেশ বোধ হচ্ছে যেন এক সুন্দর কান্তি স্নিগ্ধ মূর্ত্তি বালিকা আমার চক্ষের সামনে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। এইভাবে হয় তো ২০।২৫ মিনিট অতিবাহিত হয়েছিল। গানও থেমে গেল, আর মূর্ত্তিটিও কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল। তখন কিন্তু আমি অধৈর্য্য হয়ে সাধুকে বললুম ভারী সুন্দর, ভারী আনন্দ, কোথায় গেল সেই মূর্ত্তি? আবার দেখাও, আবার আমি দেখতে চাই। সাধু হেসে বলেন আর কি তাঁকে দেখা যায়?

আমাদেরই খুব পরিচিত এক বন্ধু তিনি নাকি কি একটা মন্ত্র সিদ্ধি করেছেন। যখন খুশী তিনি সেই শক্তিবলে অভিলষিত খাদ্য

নিয়ে এসে লোককে খাওয়াতে পারেন তার কিন্তু দারিদ্র্য কখনো গেল না। এ আবার কেমন সিদ্ধি তাতো জানি না।

বহুলোক চিকিৎসিত হয়ে ভাল হয়েছে, অন্ধ দৃষ্টি পেয়েছে, খঞ্জ চলতে পেরেছে, শুনে এক সাধু দর্শনে গেলাম। সকলে বলে খুব ক্ষমতা। ন্যাংটা বাবার অনুগ্রহে অসম্ভব সম্ভব হয়। গান চলছিল। শেষ হল। লোকজন সব ধীরে ধীরে চলে গেল। আমি চুপু চুপু সাধুর কাছে এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম। কি সাধু, সব লোকের কাছে শুনে এলাম। আমার একটা রোগী আছে, তাকে ভাল করে দিতে হবে। তুমি নাকি অনেক রোগী ভাল করেছ? আমার নিজেরও একটা রোগ আছে! দয়া করে যদি রোগটা সারিয়ে দাও তো চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো।

সাধু বলেন—তোমার তো দেখছি বেশ নধর চেহারাখানা। লালটুকটুকে গাল. পান খেয়ে ঠোঁট লাল—সবদিকেই তো দেখছি পূর্ণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ভোগও কিছু কম আছে বলে তো মনে হয় না। তোমার আবার রোগটা কি? তোমার রোগীই বা কে? আমি বলি আরে সাধু সেটা আর বুঝলে না। আমি এসেছি আমার মনের রোগ সারাতে। এই সংসারের আসক্তি থেকে কোনমতে সুস্থ করে ভগবানের পাদপদ্মে লাগিয়ে দিতে পার!

সাধু হো হো করে হেসে বলেন, আরে তুমি পাগল হয়েছ—আমি আবার সাধু। এই সাধুর কাছে এসেছ মনের রোগ সারাতে? ভুল করেছ ভাই ভুল করেছ। আমি কি আর সাধন করে সাধু হয়েছি? কতগুলি লোক আমাকে জোর করে সাধু করেছে।

তবে শোন—একদিন ঐ রাস্তা দিয়ে একজন সাধু কোথায় যাচ্ছিলেন। তিনি নিশ্চয় খুব উঁচুদরের লোক হবেন। তাঁর বেশভূষা বা অন্য কিছুই সাধুর মত না হলেও সংসারের ভোগ যে তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি সেটা বেশ বুঝেছিলাম। আমি তাঁর অনুসরণ করে প্রায় দুদিন পথ চলি। সে সময় আমার খুব অভাব চলছিল। মনটা কাজেই খুবই উদাস। খাদ্য বস্ত্র সব কিছুরই অভাব অসহ্য হয়ে উঠেছিল বলেই আমি সাধুর সঙ্গ নিই। সাধু একমনে পথ চলেন। আমি তাঁর ছায়ার মত চলি সঙ্গে। সাধু একবার দুদিন বাদে আমার দিকে খুবই করুণ দৃষ্টিতে চাইলেন। মনে হল যেন কোন্ স্বর্গের অমৃত সেই দৃষ্টিতে ছিল। আমার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে দেখে বলেন—আরে যা, তুই ঘরে ফিরে যা। তোর কোন কষ্ট হবে না। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে হরিনাম করবি। যাঁরা তোর কাছে আসবে তাঁদের নারায়ণের মত সম্মান করবি। তাঁরাই তোর দেবতা।

সাধুর আদেশে ফিরে ঘরে আসি। আমার আসক্তিতো ছিলই ঘরের প্রতি। তবে এবার এসে নিয়ম করে হরিনাম আরম্ভ করলুম। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে ভোরের বেলা একবার, আর সন্ধ্যার সময় ধূপধূনো জ্বালিয়ে একবার। কয়েকদিন একাই নাম করি। কদিন বাদে দেখি দুই একটি করে লোক এসে বসে হরিনাম কর্ব্বার সময়। আমি তাঁদের সাধুর কথামত প্রণাম করি, হরিলুট দিই। তাঁরাও খুব আনন্দিত হয়ে ঘরে যান। ক্রমশঃ আরো লোক হয়। এভাবে কয়েকজন মিলে আমার এখানে একটি হরিনামের দল গড়ে উঠল। আর সেই সব

লোক যারা প্রথম থেকে এসে জুটেছিলেন, তারাই আমাকে সাধু আখ্যা দান করলেন। যতলোক আসে সকলেই বলে সাধু। আমার মনটাও তখন যেন কেমন হয়ে গেল। আমি নাম করি, খুব আনন্দ হয়। লোকের ভীড় হয়। কেউ বলে—বাবা, আমার পেটব্যথা আপনার হাত বুলিয়ে দিলেই ভাল হবে। কেউ বলে—সাধুর অনুগ্রহ হলে কোনো বিপদই থাকবে না। কেউ আমার পা টেনে নিয়ে গায়ে পিঠে স্পর্শ করিয়ে বলে সাধুর কৃপায় আমি খুব ভাল আছি। আমার সর্ব্বশরীরের ব্যাথা দূর হয়ে গেল।

তারা সব টানাটানি করে আমায় সাধু করে। আমিও তখন লোকের হাত এড়াবার জন্য বেলপাতা ফুল মাতুলী করে দিই। আবার মাঝে মাঝে তুক্‌তাক কর্ত্তেও হয়। দেখা গেল অনেকেই রোগমুক্ত হয়। আর হবেই বা না কেন? রোগ তো চিরকালের জন্য আসে না। দু'দশ দিন বাদে স্বাভাবিক ভাবেই কতগুলি রোগ সেরে যায়। আর কতগুলি ঔষধ ব্যবহারে কম পড়ে। বাকী রইল তেমন কঠিন কঠিন রোগের কথা। তা যতক্ষণ ক্ষমতা থাকে ডাক্তার কবিরাজের ঔষধের কিছু কম হয় না। তারা আর ক'জন সাধুর কাছে আসবে। কাজেই তাদের কথা ছেড়েই দাও। আমার নাম হল, লোকের বিশ্বাস হল, আর আমিও বেশ সাধু হলাম। খাওয়াও আসে, পয়সাও আসে। সেবা যত্ন আরো কত আদর সবদিক্‌ থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল। আমি কিন্তু দিব্যিকরে বলতে পারি. সাধন ভজন কিছু করবার সুযোগ পাইনি কখ্‌খনো।

ঠাকুর যখন সাধুদের কথা বল্‌তে আরম্ভ করেন, তখন যেন পঞ্চমুখ। তিনি আবার বলেন—শুনুন তবে অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে আরও এক সাধুর সঙ্গে দেখা হ'ল। লোকের কাছে শুনলুম তিনি যাহ'ক একটা সিদ্ধিলাভ করেছেন। শুনে লোভ হ'ল দেখাই যাক্ না, সাধুর কাছে গিয়ে নিজের পোড়া মনটাকে যদি একটু রং ফিরিয়ে নেয়া যায়। এই সাধুটির মহিমা কে না বলে? যাকে জিজ্ঞাসা করি শুনি খুব বড় সাধু। সর্ব্বদা হাসিমুখ, খাওয়ার কোনো লোভ নেই। যেন সব সময়েই আনন্দে ভরা। ঘুমতো চক্ষে নেই বললেই হয়। আর কি বলব তিনি সারাদিন আছেন সব ভক্তদের সঙ্গে সদালাপ সৎপ্রসঙ্গে। অন্য বিষয় কথা মোটেই নেই। আশ্রমে সদাব্রত। কত সাধু দেশ বিদেশ হতে এসে তাঁর আশ্রমে আশ্রয় নিয়ে থাকেন। তৈর্থিক, ব্রতচারী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী সকলেই আসেন থাকেন আবার ইচ্ছামত স্থানান্তরে গমন করেন। তাঁরা সকলেই এই আশ্রমে নিমন্ত্রিতের সম্মান আদর যত্ন লাভ করেন। দেশের প্রধান প্রধান লোকেরা এসে আশ্রমে সাধুর কাছে দু'টো কথা শুনবার জন্য বসে থাকেন। কোনো কাজে তাঁর টাকার অভাব হয় না। উৎসব তো পর পর আছেই। যাগ যজ্ঞ দান ব্রত কত কিছু যে নিত্য এই আশ্রমে চলেছে সে আর বলে শেষ করা যায় না। তার উপর আছে দরিদ্র নিরাশ্রয় লোকদের মাসিক বৃত্তি সাহায্য দান। অত কাজ হয় অথচ সাধু কখনো কারও সমীপে অর্থ যাচ্ঞা করেন না। তাই অনেকেই সন্দেহ করে, সাধুর কিছু সিদ্ধাই আছে! তা না হলে অত খরচ কি করে চলে?

আমি একদিন এক বন্ধু সাধুর কাছে শুনেছিলাম—তিনি বলেছিলেন—দেখ ভাই টাকাটা সাধুর কাছে রাখাই খারাপ। হাতে এলেই একটা সৎকাজে ব্যয় করাই সাধুতা। অর্থ সংগ্রহ হলেই পাপ স্পর্শ হবে। সাধুর মুখে কথাটা ভালই লেগেছিল কিন্তু আমি গৃহস্থ মনে প্রাণে কথাটা গ্রহণ করতে পারিনি। সিদ্ধাই সাধুটির ভাবটি প্রত্যক্ষ বুঝবার জন্য একদিন তার কাছে নিজেই গেলুম। তিনি আমার পরিচয় জানতেন। পূর্ব্বে আমাকে কথকতা কর্ত্তেও দেখেছেন। হয়তো আমাকে তাঁর কাছে পাওয়ার ইচ্ছাটাও ছিল। কারণ তিনি ডেকে কাছে বসিয়ে বলেন—ঠাকুর, তোমার কিন্তু এই আশ্রমে কিছুদিন কথকতা শোনাতে হবে। অবশ্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক তোমার নিশ্চয়ই লাভ হবে। সে জন্য যেন তুমি মনে দ্বিধা করবে না। তোমায় দেখা অবধি আমার কেমন তোমাকে ভাল লেগেছে। তোমার মুখে কথা শুনে সাধুদের খুব আনন্দ হবে আশা করা যায়।

এই কৃপা আমন্ত্রণ উপেক্ষা করবার সাধ্য ছিল না আমার। আমি বিনীত ভাবে বলি—আপনার আদেশ হ'ল। আমি কথকতা করবো। সাধুদের আশীর্ব্বাদ অনুগ্রহ দৃষ্টি সে কি আর অল্পভাগ্যে হয়। তিনি বলেন—তুমিই বা কম সাধু কি? তুমি হরিকথা হরিগান নিয়েই আছ। সর্ব্বদা ভগবদ্‌ভাব ছড়িয়ে যাচ্ছ জনগণের মনের আঙ্গিনায়। তুমি হ'লে সত্যকার সাধু। বেশ-ধারণেই কি লোক সাধু হয়ে যায়? সাধু হয় সাধু কাজে।

আমি বলি—উঃ সে কথা আর বলবেন না। আজও আমার মনে তিলমাত্র বিষয়বৈরাগ্য এল না। আজও আমি ভোগের

জিনিষে লোভ করি। আমি আবার সাধু? আমার মত মন্দ বুঝি আর কোথাও নেই।

সাধু আমায় সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—আরে ঠাকুর, একি বল তুমি, এই সংসারে দেহ ধারণ করতে হলে সবই চাই যে। ঠাকুরের সেবা পূজার জন্যও মন্দির চাই, সাধু সেবার জন্য বাসস্থান এবং আহারের বন্দোবস্তও করতে হয়। এই দেখনা আমার এই আশ্রমে কি কম খরচ। এই অর্থ সংগ্রহতো আমার করতে হয়। এইতো আমার সাধু জীবন। আরে বাইরে থেকে লোক অনেক সমালোচনা করে। কোনো একটা মহৎ কাজ করা যে কত কঠিন সেটা কজন লোক বুঝে উঠতে পারে বল না?

আমি বলি—অনেকেই তো বলে টাকার জন্য আপনাকে কোনো চিন্তাই করতে হয় না। আপনি নাকি কি সিদ্ধি লাভ করেছেন যার ফলে আপনার প্রয়োজন অনুসারে অর্থ আপনার এসে যায়? এট কি সত্য কথা?

আমার কথা শুনে সাধুটি হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর তিনি বলেন—ঠাকুর! এরকম কথা আমার সম্বন্ধে অনেকে বলে বটে। তারা বলে—আমি শুনি। কি আর বলি, উত্তর দিলেই বিরোধ হবে। যে যা বলে বলুক। আরে সিদ্ধি কোন বস্তু তাতো আমি জানিনে। আমার কোন পুঁজিও নেই। ষোল বৎসর বয়সে আমি বাড়ী থেকে পালিয়ে চলে যাই তীর্থ ভ্রমণে। কত ভয় বিভীষিকা বাধা বিপত্তি আমার সেই প্রথম জীবনে। তখন আমি এক নিয়ম করে নিয়েছিলাম প্রতিদিন একলক্ষ নাম করবো। এই বার্দ্ধক্যেও আজ আমার সেই নাম ভিন্ন আর

কোনো সাধনা নেই। সিদ্ধি কাকে বলে জানি না। তবে আমি এটা লক্ষ্য করে দেখেছি, আমার হাতে কখনো টাকা থাকে না। টাকা হাতে না হলেও উৎসব করবার ইচ্ছাকে দমাতে পারি না। যখন উৎসবের আয়োজন হতে থাকে কোথা থেকে টাকা আসে ভাবতেও পারি না, কোনো দিন এমন হয়েছে ঋণ করে উৎসব করেছি। আবার অনায়াসে ঋণ শোধ হয়ে গেছে। আমার কিন্তু সংগ্রহ করবার মন কখনো হয়নি। এটাকে তোমরা সিদ্ধি বল, বিভূতি বল, যা হয় বল্‌তে পার।

সাধুর সরল প্রাণের কথায় সেদিন আমার সন্দেহ দূর হয়ে গেল। বুঝলাম ভগবৎসেবার জন্য সাধু মহতের আনন্দ উৎসব তাতে নিজের অভিমান ত্যাগ করাই প্রয়োজন। যে সঞ্চয়ী, খরচে ভয় তারই। যে চিরদিন খরচ করে অভ্যস্ত, তার সঞ্চয়ের কোনো আগ্রহ নেই। ভগবদ্‌ বিশ্বাস তার অভাব দূর করে দেয়। সে জানে জীবনটি এক মহান্‌ যজ্ঞ। দেখেছ যজ্ঞস্থলে কত বিচিত্র সামগ্রীব সমাবেশ হয়। সেগুলির প্রয়োজন সিদ্ধ হয় দেবতার উদ্দেশ্যে সমর্পণে। মানুষের জীবনেও বহু সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়। বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সহযোগে যত বস্তুই আহৃত হউক না কেন ঐ গুলির সার্থকতা পরমেশ্বর আরাধনায়—নিরভিমানে তাঁর প্রীতির জন্য সমর্পণে। যে পরিমাণে তুমি বিষয়কে ধরে রাখবে সেই পরিমাণে তুমি দুঃখ অনুভব করবে।

মানুষ নিজের অভিমানে যে কিছু কাজ করতে যায়, তার মধ্যে কোথায়ও না কোথাও কিছু ভুল থাকবেই। শাস্ত্র সদাচার উপেক্ষা করেই আমাদের যত রকম ভুলচক্রে জড়িয়ে যেতে হয়।

সাধুরা ভগবানের চরণে আত্মমন সমর্পণ করে জীবন যাপন করেন। তাই তাদের কর্মের রীতি সাধারণ লোকের মত নয়। ধরুন, একজনকার বাড়ীতে একটি উৎসব হবে, তার জন্য কত হিসাবপত্র ফর্দ্দ তৈরী করে দশদিন পূর্ব্ব হতেই তার জন্য কত ভাবনা কত প্রস্তুতি। আর সাধুর আশ্রমে উৎসব নিত্যই লেগে আছে। কোথা দিয়ে কি হচ্ছে কেউ টের পাচ্ছে না। লোকেরা যে যার মত প্রসাদ পাওয়ার সময় পাতা পেরে বসেই যাচ্ছে। দু'বেলা চলেছে এমনি রীতিতে নিত্য। এ গুলিকে কি বলবে বলতো? আমার তো মনে দৃঢ় বিশ্বাস এরই নাম ভগবদনুগ্রহ। ভগবান যে একেবারে সাক্ষাৎ উপস্থিত হয়ে বলবেন—"এই নাও সাধু উৎসবের জন্য চাল, এই নাও ডাল আর এই তোমার উৎসবের কাঁচা বাজার নিয়ে এলাম" এটা কোনো কথা নয়। বরং চক্ষে যা দেখেছি একজন লোক অজানা, বলা নেই কওয়া নেই, অনুরোধ উপরোধ ভিক্ষা যাচ্ঞা নেই, তবু নিয়ে এসেছে তার গাছের কুমড়ো, বাগানের শাক, নিয়ে এসেছে, চাল আর ডাল, আবার কোথা থেকে এল কত ফল আর ফুল গঙ্গাজল। উৎসবের অঙ্গন পূর্ণ হয়ে উঠল অনিমন্ত্রিতের পদার্পণে। সাধু কিন্তু বসে আছেন তাঁর আরাধ্য দেবতার সমীপে আর বলছেন—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। হল সবই, দেখা গেল, যারা এসেছিল তারাই সব কাজে লেগে গেল। কোথা থেকে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল অতি অল্প সময়ের মধ্যে। উৎসব হ'ল বিরাট লোক খেয়ে গেল হাজার। সাধুর কিন্তু কোনো ব্যস্ততার চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। একেই বলে ভগবৎকৃপা।

আমাদের ঠাকুরকে যখনি বলেছি মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়ে দিন তিনি শুধু হেসে বলেছেন—নিষ্ঠা রেখে জপ করে যাও। ধীরে ধীরে প্রাণে প্রাণে তোমার মন্ত্রের নির্মল তাৎপর্য্য ফুটে উঠবে। তোমাকে ব্যাখ্যা শুনিয়ে সংস্কার সৃষ্টি করতে চাই না। যে মন্ত্রটি তোমার জপ করবার জন্য বলা হয়েছে তার একটা নিজস্ব মাধুর্য্য আছে। সেটা কোনো কথার মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা ফলবতী হবে না। শব্দ অর্থ উপলব্ধি হতে পারে বস্তু তত্ত্ব অনুভব হবে না। একজনের গায়ের জামা যেমন অপরের গায়ে ঠিক সবটা ভালভাবে খাপ খায় না, সেই রকমই মন্ত্রার্থ বুঝিয়ে দিয়ে যেটুকু ভাব দেওয়া যায় নিজের জপের মাধ্যমে তার চাইতে আরো বেশী ভাব মাধুর্য্য প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা। মন্ত্র চৈতন্য সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অনেক তন্ত্রে অনেক কথা বলা হয়েছে। সেটা একটা অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের বিচার অবলম্বনে ধ্বনি সমীক্ষা ভিন্ন আর কি বলা যেতে পারে? সাধক জানেন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মত ধ্বনি তত্ত্বের বিশ্লেষণেই মন্ত্রার্থ বর্ণনার সার্থকতা হতে পারে না। নাম মন্ত্র সঙ্কল্প-কল্পতরু চিন্তামণি বললে অত্যুক্তি হয় না। এই নাম মন্ত্র উৎকণ্ঠায় আর উদ্বেল লালসায় প্রায়শঃ সাধকের প্রাণের আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ মাধুরী মণ্ডিত হয়। এটা শুধু ছক এঁকে বা বিধিবিধানের মাধ্যমে ধরে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। নামমন্ত্র অভাবনীয় শক্তি প্রকাশে সমর্থ।

আমরা জেদ করেছি মন্ত্রার্থ যদি না বলেন নামের অর্থ বলে দিন। ... হরি নামের অর্থ হরিকে ডাকা। যদি বল হরি কে? তবেই তো বড় কঠিন সমস্যা। হরি কথার অর্থ করেই তো আবার

দোষের তলায় পড়তে হবে। অর্থ করাতো কোন কাজের কথা নয়, অর্থে পৌঁছানই হলো কাজ। হরিই পরম অর্থ। সেই পরম অর্থের আর অর্থ কি করবে বল? অভিধানেতো হরি অর্থ সাপ, বেঙ, সিংহ, কত কিছুই আছে। হরি অর্থে যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুও বুঝা যায় তাতেও কোনো বিরোধ করবার কিছু নেই; কিন্তু তার একটা প্রধান অর্থ আছে যেটার জন্য এই নামই পরম ব্রহ্মের নাম বলা হয়েছে। আরও শাস্ত্র বলেছে, নাম আর নামী ভিন্ন নয় অর্থাৎ যেই নাম সেই কৃষ্ণ। হরি শব্দ পাওয়া আর কৃষ্ণকে পাওয়া একই কথা। কেউ বলতে পারে শিব কালী দুর্গা গণেশ সূর্য্য সব অর্থ বুঝা যায় এক শব্দে। বুঝুক তারা যেমন তাদের সংস্কার আর যেমন তাদের যুক্তি। আমি কিন্তু হরি বল্‌তে প্রধান অর্থ টা ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু বুঝতে চাইনা। আর অন্য দেব দেবীর সঙ্গে কৃষ্ণের সমতাও ভাবতে পারি না। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখো সাধারণতঃ যেই কালী সেই কৃষ্ণ এরকম একটা ব্যাখ্যা করতে পারলে খুবই তৃপ্তি বোধ করে অনেকে, আর তাতে করে লোক সংগ্রহের সুবিধা হয়।

কোনো বিশেষ রূপে ভগবানকে আরাধনা করাটাকে তারা সাম্প্রদায়িক বলে কটাক্ষ করেন। এই রকম লোকেরা নিজেদেরও ভগবান বলে পূজা করায়। পুরাকালেও এরকম লোক ছিল না তা নয়। ভাগবতে এক নকল বাসুদেবের কথা আমরা শুনি। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা লীলার সময় সেই ব্যক্তি এক দূত পাঠিয়ে কৃষ্ণকে বলে তুমি তো বাসুদেব নাম মিথ্যা করে প্রচার করছ। আমাদের রাজাই সত্যকার বাসুদেব। নিজের মহিমা প্রচারের জন্যই এই

নতুন বাসুদেব চারিটি হস্ত ধারণ করেছিল, পীতাম্বর, বনমালা, কৌস্তুভ এবং অন্যান্য ভূষণেরও অনুকরণ করেছিল। এই মিথ্যা বাসুদেবের প্রচার বন্ধ করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কাশীতে এসে তাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং তার রাজধানী পুড়িয়ে দেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকটকালেও এরকম লোক ছিল যে নিজেকে গোপাল বলে প্রচার করতো। লোকে তাকে গোপাল না বলে শৃগাল বলতো। যে লোক ভক্তির পথে চলে, সাধক বলে অভিমান করে, সে কি কখনো তার আরাধ্য ভগবানের সঙ্গে নিজের সমতা, ভাবনা করে, না নিজেই ভগবান বলে প্রচার করে? কখনো তা হতে পারে না। যদি কেউ এভাবে প্রচার করে যে আমিই ভগবান, তবে জেনো সে ব্যক্তি ভক্ত মোটেই নয়।

হতে পারেন তিনি একজন ব্রহ্মজ্ঞানী। তার কাছে নামের ব্যাখ্যাও অনেক রকম হবে। কখনো শুনবে এই হরিই হংস, কখনো শুনবে হরিই শিব, আর কখনো শুনবে হরিই আমি। "মহাপ্রভু বলেন কৃষ্ণ নামের বহু অর্থ তাহা নাহি মানি, শ্যাম সুন্দর যশোদা নন্দন এই মাত্র জানি।" এই সম্বন্ধে নাম কৌমুদীতে বিশদ বিচার আছে প্রয়োজন হলে দেখে নিও। যত নাম আছে সব নামই বিষ্ণুর নাম। বিষ্ণুই পরম দেবতা। তারই নাম প্রয়োজন অনুসারে অপরকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। নামের তাৎপর্য্য এইভাবে গ্রহণ করবার নির্দ্দেশ শাস্ত্রে দেখা যায়। নিরভিমান হয়ে নাম করো। নিজেকে সকলের সেবক মনে করে নাম কর। দম্ভ পরিত্যাগ করে নাম কর। নামের মাধুরী হৃদয়ে প্রকাশ হবে। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত করার সাধন তোমাদের পথ

নয়। সেটা হল তন্ত্র সাধনার একটা দিক, ষট্ চক্র ভেদ প্রভৃতির নামে যোগীপন্থীদের সাধনার অঙ্গ। এদের সাধনায় আসন, প্রাণায়াম, যোগসাধনার ক্রমগুলি বিশেষ যত্ন করে অভ্যাস করতে হয়। মুলবন্ধ, জালন্ধর ও উড্ডীয়ান বন্ধ সাহায্যে দেহস্থ প্রাণ বায়ুকে ইচ্ছামত সংযত ও চালিত করেই এক আনন্দ অনুভূতির দিকেই যোগীর দৃষ্টি।

দেহকে নিয়েই তার প্রধান সাধনার আরম্ভ এবং প্রাণ বায়ুর নিয়ন্ত্রণেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি। পরমেশ্বর আরাধনা বিকল্পে সাধনা। কাজেই ভক্তিরস তাহার অনাস্বাদিত। ইহাতে প্রাপ্তি নির্ব্বাণ মুক্তি, ব্রহ্ম সাযুজ্য। এই ব্রহ্ম সাযুজ্য ভক্তের একান্ত ভাবে পরিত্যজ্য। ভক্ত সাধক প্রেম সাধনার পথে চলেন।

একদিন ঠাকুর আমাদের ডেকে কাছে বসালেন। এরকম করে তিনি কখনো কাছে বসবার জন্য নিজে বলেছেন সেটা স্মরণ পথে আসছে না। তবে সেদিন যেন ঠাকুর একটি আবেশেই আছেন বেশ দেখা যাচ্ছিল। কাছে বসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি খুব কাঁদতে লাগলেন। আমরা তাকে যতই জিজ্ঞাসা করি, ঠাকুর—তোমার কি হলো কাঁদ কেন? ততই যেন বেশী করে চোখের জলে বুক ভেসে যায়। এই ভাবটা ৫।৭ মিনিট পরেই কেটে গেল। তখন দেখি ঠাকুর হো হো করে হেসে লুটোপুটি খাওয়ার মত করছেন। অল্প সময়ের ব্যবধানে এরূপ ভাব বিপর্য্যয় দেখে মনে ভয় হচ্ছিল, তবে কি ঠাকুরের মাথায় কিছু রোগটোগ হল। এ যেন মস্তিষ্ক বিকৃতিরই পূর্ব্বাভাষ। ঠাকুর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। নেই পূর্ব্বের মত শাস্ত্র উপদেষ্টা। তিনি বলেন—দেখ ধরণীধর, খুব

আদর্শ চরিত্র হওয়া দরকার। আমার জীবনের একটি গোপন কথা আজ তোমাদের কাছে না বলে আব কোনোমতেই আমার মনটা রেহাই পাচ্ছে না। মনটাকে যদি উন্নত করবার ইচ্ছা হয় তা হলে আমার মতে প্রাণের যে কিছু আকূতি ও অভীপ্সা সেগুলি চাপা দিয়ে না রেখে খোলাখুলি প্রকাশ করে দেওয়াই ভাল। আমার প্রথম জীবনের কথা তোমাদের বলছি। হয়তো একথাগুলি তোমাদের উপকারেই আসবে।

আমার বৃদ্ধ জেঠা মশাই। তিনি ছিলেন পুরাণ শাস্ত্রে প্রধান পণ্ডিত। একদিন গোপনে ডেকে আমায় বলেন, দেখ হে বাপু, তুমি তো এই অল্প বয়সেই কথকতায় প্রবৃত্ত হলে। তা জানো, এ পথে অনেক প্রলোভন আছে। তোমার যে রূপ আর যে বয়স এটা কিন্তু লোকরঞ্জনের জন্য খুব চমৎকার লাভজনক হলেও ভয়-সঙ্কুল। একথা আমাকে আজ বলতেই হচ্ছে। তোমার কথা শুনে কতজনের কত প্রীতি ভালবাসা জাগবে তারা তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত শুধু নয়, আত্মীয়তা স্থাপনের জন্যও আগ্রহান্বিত হবে। সেই সব ক্ষেত্রে তুমি যদি প্রথম থেকে সাবধান না হও অনেক ক্ষেত্রে তোমার পরাভূত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ভাগবতরত্নের কথাটার তাৎপর্য্য তখন আমি বুঝতে পারিনি। তবে আমি সব সময় খুবই সাবধান হয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়েছিলুম সেই অযাচিত উপদেশের পর থেকে। এমন ভাবে আমি চলতুম যে হঠাৎ কোনো নর নারী আমার খুব কাছে এসে আদর আপ্যায়নের সুযোগও পেতো না। এক কথায় অনেক মেয়েছেলে আমাকে দেখে পিছিয়ে যেতো হয়তো তারা মনে করত এ লোকটি মোটেই স্ত্রীলোকদের ভালচক্ষে দেখে না।

বেশ কিছুদিন যেতে না যেতে আমি পড়লুম বিষম এক অগ্নি-পরীক্ষায়। সে দিন সন্ধ্যায় কথকতার পর মাত্র উঠে দাঁড়িয়েছি বেদী থেকে নেমে আর এমন সময় উঠ্‌লো ভয়ানক ঝড়। ঘন বিদ্যুৎ মেঘের গর্জন আর সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। ঝড়ে জলে যারা সব পুরাণ শুন্‌তে এসেছিলেন তাদের সেদিন কি দুর্দ্দশা! সুবিধা বুঝে কেউ পালালেন, কেউ চালা ঘরে আশ্রয় নিলেন, কেউ ভিজে একশা হয়ে গেলেন। আমি কিন্তু বেদীর কাছেই ভাগবত আড়াল করে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে। আমাকে বেষ্টন করে আছে একদল ভদ্রমহিলা তারা জল ঝাপাটায় আর কোনোদিকে এগুতে পারলেন না, তাই আত্মরক্ষার জন্য বেদীর চারদিকে অল্পপরিসর জায়গাটিতে বিশেষতঃ তাদের জনপ্রিয় এই কথকঠাকুরের কাছে সুরক্ষিত স্থানটিতে নিশ্চিন্ত হয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। আমি তাদের মাঝখানে। দু একটি মেয়ে অসঙ্কোচে আমার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ায় ঠাকুর বলে। আমিতো আর ঠাকুর হয়ে যায়নি তাই আমার যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। আর ভাবছিলাম ভাগবতরত্নের কথা "সাবধানে চলো।"

ক্ষণকালের মধ্যেই যে মানুষ কেমন করে মুগ্ধ হতে পারে, দগ্ধ হতে পারে তার যেন একটা আভাষ তখন পেলাম। ঝড় থামলো বৃষ্টি বন্ধ হল, কিন্তু আমার মনের ঝড় ক্রমে ভীষণ আকার ধারণ করল। কোন্ আকর্ষণে আমাকে মুগ্ধ করে ফেলেছে। কোন আকর্ষণে আমাকে বশ করে ফেলেছে। কোন্ ক্ষণে আত্মসংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। কোথায় পাঠ ব্যাখ্যা কথকতা আর গান এক মুহূর্ত্তে সব ভুল হয়ে গেল, সেদিন ঘরে এলাম কিন্তু মন আমার

কাছে ছিল না। দিন রাত্রি শুধু একভাবনা সেই যে সেদিন ক্ষণেকের জন্য একটিদেহের সঙ্গে স্পর্শ-পরিচয়। সেটিই যেন ভাবনায় উপভোগ্য হয়ে উঠল সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায়। অসহ্য মনোবেগ—অধৈর্য্য প্রাণ।

ভুলে গেলুম নিজের সত্ত্বাকে ভুলে গেলুম আর সবাইকে ; ঠিক এই ভাবে কেবল তাহারই সঙ্গলালসা আমাকে যেন দিনের পর দিন পাগল করে তুল্‌লো। একদিন অব্যক্ত মর্ম বেদনায় কাতর উৎকণ্ঠার প্রাবল্যে আমার মনের গোপন কথা বল্‌বো বলে গেলাম ছুটে তাদের বাড়ী। আমাকে পেয়ে তারা সবাই খুব আনন্দিত আর মেয়েটি বুঝি কেমন করে আমার প্রাণের গন্ধ পেয়েছিল তাই সে খুঁজছিল একটু নির্জনে আমার সান্নিধ্য। মেয়েটির নাম এখনো ভুলিনি—তার নাম ছিল রঙ্গ। সে আমায় খুব যত্ন করে খাবার জন্য ফলমূল নিয়ে এল। আর ভাল একখানা আসন তার নিজে হাতে বুনানো সেটি পেড়ে দিয়ে আমায় বস্‌তে বলে। তার বাবার এক বন্ধু এসেছিল তাই তাকে নিয়ে তিনি বাইরের ঘরে বসেছেন—রঙ্গর মা জল খাবার তৈরী করছেন আগন্তুক ভদ্রলোকের জন্য, আমার কাছে শুধু রঙ্গ। আমি আসনে বসলুম। যেন কোন্ এক অজানা রাজ্যে আমাকে কে আকর্ষণ করছিল তখন? রঙ্গ আমার কাছে বসে, আমিও অপলক নেত্রে তার দিকে চেয়ে থাকি অবাক বিস্ময়ে। দেখি তার চোখ গড়িয়ে জল পড়ছে। জিজ্ঞাসা করি কাঁদ কেন রঙ্গ. সে বলে আপনার জন্য। কথাটা শুনে আমি শুধু বিস্মিত হলাম তা নয়, ব্যথিতও হলাম। সে কি রঙ্গ আমার জন্য কাঁদার কোনো অর্থতো আমি বুঝলাম না? সে

বলে— না, তা, আপনি বুঝবেন কেন? আপনি জানেন বার বার আমার দিকে চেয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে। আপনি হয়তো জানেন যে আমি হতভাগিনী। আমার বলতে এ জগতে আর কেউ নেই পিতা মাতা ভিন্ন। বড় সাধ করে অল্প বয়সে পিতা আমার পরের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন ঘর জামাই করে পুত্রের সাধ মেটাবেন বলে তাতো হলই না বরং আমাকে যে ভালবাসে তার কখনো ভাল হয় না। আপনি আমার দিকে আর কখনো চাইবেন না। দেখবেন না। দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন না। আমি ব্রত নিয়েছি কোনো পুরুষের সর্বনাশ আমি করবো না। আমার বয়স, আমার রূপ, আমার পরিবেশ, যদিও আমার সঙ্কল্পের সহায়ক না হউক আমি, দেবতার নামে ব্রত নিয়েছি এক শ্রীকৃষ্ণই আমার দেহ মন প্রাণের মালিক। এই দেহ আর কাউকেও আমি দিতে পারি না। কথা শুনে যেন আমার চেতনা ফিরে এল। নিজেকে বার বার তিরস্কার করি মনে মনে ছিঃ আমি কি অসৎ নিন্দিত কার্য্য করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। এই কচি বয়সের মেয়েটি আমায় শিক্ষা দিলে— আমায় রক্ষা করলে তার আদর্শ দিয়ে। সে যদি তার দেহ মন শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করে ব্রতচারিণী হতে পারে। অত শাস্ত্র পড়ে লোকের কাছে পাণ্ডিত্য করে আর অত উপদেশ দিয়েও আমি এই লোভের হাতে রেহাই পাবো না নিশ্চয় পাবো।

চারিদিকে ব্যস্ততার মধ্যেও স্থির চিত্ততা আমাদের ঠাকুরের যেমন দেখেছি, এমন আর কারুর সম্বন্ধে বলা যায় কি না জানি না। ঠাকুর কখনো কাকেও বলেননি যে—তোমরা চুপ কর। আমি ধ্যান করছি কি কথা বলছি তোমরা স্থির হও, কি চুপ করে আমার

কথা শোন। তিনি যেন সব সময় নিজেকে নিয়েই ভুলে আছেন। বাইরের কেউ তাকে ডেকে কথা বলে ভাল, না বলে তো আরো ভাল। এই যে স্থির ভাব এটা কি কম সাধনার ফল। আমরা তো অনেক দিন ধরেই ঠাকুরকে দেখেছি। তিনি তো বেশীর ভাগ বহু লোকের মাঝেই থাকেন। তিনি যে কখন কি সাধনা করলেন কোথায় নির্জ্জন অবসর পেলেন তাতো বেশ লক্ষ্য করতে পারিনি। তবে এটা সত্য তাকে আমরা দেখেছি একটু বেলায় ঘুম ভাঙ্গে। তবে কি তিনি গভীর রাত্রিতে কোনো সাধনা করেন? না তাও হয় না। আমরা লক্ষ্য কবেছি ঠাকুব যেই শয্যায় গেলেন আব অমনি নিদ্রা।

এই ভাবে অত তাড়াতাড়ি শয্যায় গা ঠেকাতে না ঠেকাতে গভীর ঘুম খুব অল্প লোকের ভাগ্যেই হয়। তবে তাঁর সাধন ভজন কখন হয়। এ বিষয়ে একটা সন্দেহ বরাবর আমাদের মনে ছিল। একদিন ঠাকুর নিজেই তাব সমাধান করে দিলেন— তিনি বলেন সাধন ভজন একটা পোষাকী জিনিষ নয়রে। এটাই দেহ মনের একটা স্বাভাবিক ক্রিয়া বলে মনে করে রাখ, সাধন ভজনকে যদি একটা ঔপাধিক বা আগন্তুক ব্যাপাব বলে মনে করিস্ তো এই সাধন ভজন নিয়ে তোকে অনেক সময় একটু অসুবিধায় পড়তে হবে। সংসার যে গতিবেগে চলেছে আর আমাদের পরিবেশের যেরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন হচ্ছে তাতে কখন যে কোন্ দিক্ থেকে কোন বাধা এসে তোর আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর আঘাত করবে তার কোনো স্থিরতা নেই। এই কিছুদিন আগের কথা বলি। মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে আরতি

হচ্ছিল। হঠাৎ এক ফতোয়া জাহির হল কাঁসর ঘণ্টা বাজানো বন্ধ করতে হবে। অধার্মিকের বিধান সবসময়ই কোনো না কোন ধর্ম বিশ্বাসের উপর আঘাত করবে। এই সব আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য চাই দৃঢ়তা এবং মনের অভ্যাস। মন যদি পরমেশ্বরে মগ্ন হয়ে থাকে তখন বাহিরে কাঁসর বাজলো কি বাজলো না তার কোন সন্ধান হবে না। শুনেছ তো শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে প্রভু যে সাধনা করবার উপদেশ করেছিলেন তার প্রধান কথা হচ্ছে অন্তর্মনা হওয়া।

(৭)

মানুষ যতই সাধুতার বেশভূষা প্রদর্শন করুক না কেন যদি না তার মন অধ্যাত্ম জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়ে শুধু বাহিরের লোক দেখানো পোষাকে তার আর কতটা উন্নতি হতে পারে? হ্যা সাধু বেশের একটা প্রভাব আছে। মহতের সঙ্গ লাভ হয়, সাধু সঙ্গে বাস সম্ভব হয়। এই দিক্ দিয়ে মহতের কৃপা ভগবৎ কৃপাও লাভ করবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যদি অর্থ সংগ্রহের জন্যই শুধু সাধু বেশ ধারণ হয়, যদি শুধু আত্মপ্রচারের জন্যই দেশ বিদেশ ভ্রমণ হয়, যদি দল বৃদ্ধির জন্যই অপরের ধর্ম্মের সমালোচনা ছলে নিন্দা করা হয়, তাতে করে কি আর সত্যকার সাধুতা জীবনে ফুটে উঠে? আমাদের ঠাকুর কখনো কিন্তু নিজের গৌরব বৃদ্ধির জন্য কিছুই করেন নি। তিনি প্রথম জীবন থেকে ছিলেন অন্তর্মুখী ভাবসাধনায় মগ্নচিত্ত। তাই তাকে বাইরের কোনো প্রভাবে ব্যস্ত করতে পারেনি।

বৃন্দাবনে এসে যে বাড়ীটিতে ঠাকুর উঠলেন সেটা হল প্রসিদ্ধ ভক্ত বাজার। কোনো অসুবিধা নেই, সঙ্গের ভক্ত ও ভক্তারা নিজেদের পছন্দসই স্থান বেছে নিয়ে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য সংসার পেতে বসলেন। ঠাকুরের নিজের জন্য যেন কোনো প্রয়োজন নেই এমনি উদাসীন ভাবে তিনি কদিন আছেন। মনে হল শ্রীধাম বৃন্দাবনে এসে ঠাকুরের সেই ঔদাসীন্য যেন আরো তীব্র ভাবে দেখা দিল। আমরা সব অবাক্ হয়ে দেখি ঠাকুর কি করেন।

ভোরের বেলা কারুর সঙ্গে কোনো কথা নেই। চুপ্ করে বেড়িয়ে পড়লেন রাস্তার উপর আর হন্ হন্ করে চললেন মন্দিরের দিকে ? সেখানে গিয়ে তিনি কতই না আকুলতা প্রকাশ করছেন। আর দু'চোখ দিয়ে তার অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে দরধারে।

এইমাত্র শ্রীগোবিন্দজীর আরতি আরম্ভ হয়েছে। "কত মন্দিরে তোমার আরতির প্রদীপ জ্বলে ঘৃত কর্পূর সহযোগে কত ধূপধূনার গন্ধে আমোদিত করে তোমার বেদীমূল ! হে প্রিয়তম, সেখানে আমারও প্রদীপটি জ্বালিয়ে রাখবার অধিকার দিও। তুমি আমায় দিও সেই ভরসা যেন আমার গুণদোষের ধূপ জ্বালিয়ে তোমার প্রেমময় স্বরূপের আনন্দ বিধান করতে পারি। কত হাসি কান্না কত ব্যথা বেদনা কত শত গঞ্জনা লাঞ্ছনার দৈন্য তুমি প্রতিনিয়ত তোমার মহিমায় সমুজ্জ্বল করেছ, সান্ত্বনায় করুণায়। আমার জীবন প্রদীপ অনির্বাত রাখলে তোমার সেবায়। হে আমার অন্তরতম, প্রার্থনা নাই আমার আছে শুধু নিবেদন, চাইবনা কিছু তোমার করুণার দ্বারে শুধু অপেক্ষা করব তোমার সেবানুমোদন প্রতীক্ষায়। আশায় সঞ্জীবিত, করুণায় অভিষিক্ত, ব্যথায় পরিশুদ্ধ,

হতাশায় পবিতৃপ্ত তোমার সেবক তোমার জয়গান করে কৃতার্থ হউক।"

এই কথাগুলি ঠাকুর যেন নিজের সঙ্গেই নিজে বলছিলেন। পুষ্পাঞ্জলির সঙ্গে আরতির বাদ্য স্তব্ধ। তখন কে কার আগে মন্দিরের ধূলায় প্রণাম করবে লুটে আর ছুটে বাইরে যাবে এই ছিল দর্শক ভক্ত ও ভক্তাদের চেষ্টা। ঠাকুব কিন্তু জগমোহনের এক পাশে পূর্ব্বের মতই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে পড়লেন শান্তভাবে। তখন তাঁব মুখে চোখে যেন দিব্য আলোকেব মহামাধুর্য্য। মগ্ন হয়েছেন ঠাকুব ভাবে। আমরাও ঠাকুবের ঐ অবস্থা দেখে তাব কাছেই বসে পড়লাম।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পবিত্রতায় কেটে গেল। আমাদের কানে যেন শুধু সেই আবতির মঙ্গলধ্বনিই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। কারুর মুখে কোন কথা নেই। সকলেই চেয়ে আছি তাব মুখেব দিকে যদি কোনো উপদেশ করেন এই আশায়। তিনি যেন কোন মধুরা-মৃতের স্নিগ্ধ শীতলতায় প্রাণটিকে রসায়িত করে বলেন—শোনো শোনো, আজ আরতির সময় কেমন করে উঠ্‌লো আমার মনটা। আমি দেখছিলুম কে যেন আমার কানের কাছে এসে চুপি চুপি বলছিল "ঠাকুর তুমি আর এখন সেই আগের মানুষটি নও। এখন তুমি বৃন্দাবনের গোপী, জানতো আমাদের মোহনের আরতির সময় আমরা সকল গোপী কত আদব করে তার জয় মঙ্গল গান করি তুমিও আমাদের সঙ্গে গান ধর, বল মধুর স্বরে বল. মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর", তাদের কথা শুনে তো আমার কণ্ঠরুদ্ধ।

আমি অবাক্ হয়ে দেখি তাদের রূপ, আর শুনি কণ্ঠের

মধুর সঙ্গীত। বিশ্বের কোনো সৌন্দর্য্য তাদের তুলনা হয় না। গানের মাধুরী অলৌকিক। মনে করেছিলাম এরা বুঝি ভক্তি মূর্ত্তি। শুনেছি ভক্তি ভগবানে অনুরক্তি। সেই অনুরক্তি আসক্তিই যেন নানামূর্ত্তি হয়ে যুগল কিশোরের আরতির গান করছিল। মধুর তাঁদের কণ্ঠস্বর কমনীয় তাঁদের রূপ, লাবণ্য তাঁদের প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে, দৃষ্টিতে তাঁদের করুণা, মুখমণ্ডলে প্রশান্ত-হাস বিকাশ। সুবাসে আমার নাসা পুলকিত। তাঁদের বাতাসে যেন অমৃত স্পর্শ, দৃষ্টি আমার অফুরন্ত মাধুর্য্য ভোগ করছিল, কি যে এক অনির্ব্বচনীয় মধুময় পরিবেশে আমাকে আকর্ষণ করে নিয়েছিল সেটি যেন আর মনে ধরে বলতে পারছিনা। আমায় ক্ষমা কর ভাই, আমায় ক্ষমা কর।

ঠাকুর কথা বলতে বলতে যেন অবশ দেহে মন্দিরতলে লুটিয়ে পড়ছিলেন। বন্ধুরা সব ধরে ফেললেন, তখন ঠাকুর আর এ রাজ্যে নেই। তিনি তার সাধু ভাবময় আনন্দ বৃন্দাবনে যুগলের আরতি দর্শনে মগ্নচিত্ত। কিছুক্ষণ সকলেই এই দেখে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। কারও মুখে কথা নেই। ঠাকুরঘরে ঘণ্টা বেজে উঠল ভোগের সময় হয়েছে। মন্দিরে গোবিন্দের ভোগ হচ্ছে। আমরা সকলে ঠাকুরকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে যাব স্থির করেছি। পূজারীজি মন্দির থেকে বেড়িয়ে এসে বলেন, ওকে আপনারা অমন করে টানাটানি করবেন না। উনি তো স্বস্থানে নেই। শ্রীগোবিন্দের মন্দিরে। অত অস্থিরতা কেন? স্থির হউন। দেখ্তে পাচ্ছেন না ওঁর ভাবসমাধি হয়েছে। ভাবুক ভক্তসাধক উনি, ওরকম ভাব খুব কম দেখা যায়। মন্দিরে

ভোগ হচ্ছে আপনারা ওর জন্য কিছু প্রসাদ নিয়ে যাবেন। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। প্রায় ঘন্টা দুই বাদে ঠাকুরের সংজ্ঞা ফিরে এল। ঠাকুর বলেন আজকে আমি মন্দিরে এসে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। চল বাসায় ফিরে যাই।

এই কদিন হল ঠাকুর ফিরে এসেছেন। এবার বৃন্দাবন যাত্রাটা মন্দ হয়নি। তবে ঠাকুরের শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল আর তিনি যেন কেমন আনমনা ভাবে কদিন ছিলেন। তাই সঙ্গীরা আর দেরী না করে তাঁকে নিয়ে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরেছেন।

ঠাকুর বসে আছেন বিষণ্ণ হয়ে। যেন কি একটা ঘটেছে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম ঠাকুর কেমন আছেন? তিনি মুখ তুলে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে বলেন—কিহে যোগেশ, এস। বৃন্দাবন থেকে এসে তোমাকে আমি খুজছিলুম। সব ভাল তো? এদিকে কেমন ছিলে? হরি কথা কেমন চলেছে? নতুন কারুর কথা শুনলে?

আমি বলি, আজ্ঞে ওপাড়ায় একজন সুকণ্ঠ কথক এসেছিলেন তিনি বেশ কয়েক দিন কথা কীর্ত্তন করেছেন।

ঠাকুর বলেন তিনি কোন্ পালা গাইলেন। ভাগবত ধরে বলেন, না আর কিছু?

আমি বলি সকাল বেলা তো পুরাণ পারায়ণ নিয়মিত চলছিলই। সন্ধ্যাবেলা চক্রবর্ত্তী ঠাকুর যখন গান গাইতেন তখন আর ভাগবত প্রয়োজন হতো না।

আমি বলি, ঠাকুর সে কথা আর আপনাকে আমি কি বলব? পুরাণ ভাগবত মাথায় থাকুক, যত রাজ্যের গল্প, গান, হাসি আর

রগড়। তা লোক হতো খুব। অত লোক যাত্রা গানেও হয় না। পাওনা গণ্ডাও বেশ হত। এক একদিনে যে প্যালা পাওয়া যেত তাতে অপর কথকের এক মাসের প্রণামী। ঠাকুর বলেন বলো কিহে তবে তো তিনি খুব গুণী লোক।

কি কথা তিনি বললেন দুটো চারটে কথাও মনে রাখতে পারলে না। আজ্ঞে তা আপনার কৃপায় কিছু কিছু যে না রেখেছি তা নয়, তবে সে সকল কথা বেশ শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সম্মত বলে মনে হয় না।

ঠাকুর বলেন, যোগেশ সে কথা আর আজকাল বলো না। যে যত আবোল তাবোল বলতে পারবে সে-ই তত ভাল কথক হে। সে কালের কথকেরা ভাষা শিক্ষা কর্ত্তেন, তাঁদের ব্যাকরণ ছন্দ কাব্য অলঙ্কার জ্ঞান বেশ থাক্‌তো, তবে তারা ভাগতের কথকতা করবার জন্য ব্রতী হতেন। এখন ছাপা বই থেকে কিছু টুকে নিলে আর নিজের মনোমত কতগুলো গান ছড়া, রচনায় একটু রঙ্গরস করে জমাতে পারলেই হল। শ্রোতারাও সেই অল্পের রগড় দেখ্‌বার জন্য হুজুগে। কাজেই গান আর গল্পই হয় কথকতার প্রধান তম অঙ্গ। যথার্থ শাস্ত্র তাৎপর্য্য, সে পড়ে থাকে অনেকটা পশ্চাতে। যারা নিছক শাস্ত্র কথা নিয়ে এ বাজারে নামবে তাদের জমাতে ঘটাতে একটু বেগ পেতেই হবে। পুরানো ধ্রুব প্রহ্লাদের কথা শোনবার লোক খুব কম তার শোনাতে হলেও নতুন করেই শোনাতে হবে।

আমি বলি ঠাকুর আপনি কখনো ভাগবত ভিন্ন কোন কথাই বেশী বলেন না। গল্প দৃষ্টান্ত গান রগড় কিছুই তো আপনার

কথকতায় প্রধান স্থান পায়নি কোনদিন। তবুতো আমাদের কাছে আপনার কথাগুলো যেমন মিষ্টি লাগে তেমন আর কারুর কথা লাগে না। ঠাকুর বলেন, দেখ যোগেশ, তুমি যেমন বলছ এমন কথা আরো অনেকের কাছে শুনেছি। দেখ, আমি যে গান তৈরী করিনি তা নয়। আর গল্পও যে আমার গুরুদেবের দেওয়া কম তা নয়, তবু জানো ভাগবতের কথা আমার যেমন মিষ্টি লাগে তেমন আর কিছু না। আতরওয়ালা বাড়ী বাড়ী ঘুরে আতর বিক্রি করবার জন্য চেষ্টা করে, যে ক্রেতা সে বেশী দাম দিয়েও আতর ক্রয় করে। অল্প দামী এসেন্স খুব তীব্র গন্ধ হলেও তারা ক্রয় করেন না। আতরওয়ালা ক্রেতা কম পেলেও যতবার আতরের শিশি খোলে ততবারই সুগন্ধ পায় এটাই তার বড় লাভ। আমিও ভাগবত যতবার খুলি আর পড়ি কেউ নিক আর না-ই নিক আমার তো লাভ হয়ই।

(৮)

ঠাকুব দুপুরবেলা বিশ্রাম করছিলেন। দুটি যুবক আসতেই তিনি উঠে বসলেন, তিনি বললেন—কি বাবা কি চাও? তাদের একজন বলে উঠল—ঠাকুব, আপনি যে বলেছেন, যোগমায়া মানে বংশী—এই কথাটার অর্থ কি? আমরা জানি যোগমায়া ভগবতী দুর্গা, ভগবানের মহাশক্তি, সে আবার বংশী কি করে হল? ঠাকুর বলেন—ও, এই কথা! যোগের জন্য যে মায় সেই হচ্ছে যোগমায়, মায় কথাটার অর্থ হল শব্দ, এই শব্দ ওঠে যা থেকে তার নাম হচ্ছে যোগমায়া বংশী। বংশী মুখযোগে শব্দ করে, যে শব্দ হয় তার মূল

সরস্বতী, তিনি ভগবতী। আর তিনি বেণু বংশী আর মুরলী এই তিনভাগে বিভক্ত হন। অনেক দিনের আগের কথা—মুর নামে একটা দৈত্য ছিল। সে যখন তখন যে কোন মূর্ত্তি ধারণ করতে পারতো। অপরের মূর্ত্তিও পরিবর্তন করতে পারতো। একবার সে কামদেবকে গরুড় করে নিজে বিষ্ণু মূর্ত্তি ধারণ করে ব্রহ্মার স্থানে সত্যলোকে এলেন। সেখানে বেদ হরণ করে বিষ্ণুলোকে সরস্বতীর গৃহে উপস্থিত হলেন। সরস্বতী বিষ্ণুরূপ দেখে তাঁকে প্রণাম করলেন, গরুড়াসনে বিষ্ণুকে দেখে তাঁকে প্রণাম করলেন বটে, কিন্তু মুখ ম্লান। কপটবেশে মুর বলে— আহা তোমার মুখ ম্লান কেন, এস আমার সঙ্গে, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি। সরস্বতী সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্ত্তি হলেও কপটতা বুঝতে না পেরে তার সঙ্গে গেলেন। অসুর কিন্তু তাকে নিয়েই নিজের গৃহে এসে উপস্থিত হল। তখন আর অসুরের বিষ্ণুমূর্ত্তি নেই। তার নিজের মূর্ত্তি ধরেছে। সরস্বতী ভয়ে দুঃখে কাতর হয়ে অশ্রুধারা বর্ষণ করেন। আর তার ফলে হল অশোক বৃক্ষের উৎপত্তি। এইদিকে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে নিয়ে সত্যলোকে আসতেই সাবিত্রী বলেন—এই যে প্রভু বেদ নিয়ে গেলেন, আবার কেন? ব্রহ্মা বেদ অপহরণের আশঙ্কা করে বিস্মৃত। বিষ্ণু ফিরে এলেন স্বস্থানে। সেখানে দেখেন সরস্বতী নেই। ভগবান দুজন দূত সুশীল ও পুণ্যশীল নামে তাদের পাঠালেন বেদ খুঁজবার জন্যে। তারা এসে দেখে অশোক গাছের তলায় অত্যন্ত ম্লান শোকগ্রস্ত সরস্বতী রয়েছেন। তারা বলে মা এখানে কেন? দূতেরা সবকথা শোনে। দুষ্ট মুর নায়ক অসুরের সাথে যুদ্ধ করে। অসুর কখনও মহিষাকার কখনও

ব্যাঘ্রের আকার ধারণ করে যুদ্ধ করে। বিষ্ণুও এলেন সংবাদ পেয়ে। বিষ্ণু তাকে বিনষ্ট করলেন। সরস্বতীকে নিয়ে তিনি বৈকুণ্ঠে ফিরে এলেন। তিনি দেবীকে বললেন—তুমি আমার প্রেয়সী হয়েও অসুরের মোহে পড়লে! যাও, তুমি বৃন্দাবনে, বৃক্ষ হয়ে থাকো। সেই বৃক্ষই বংশ। আর এই বংশ থেকেই বংশী। মুরলীর পুরানো কথার সঙ্গে এক রাজার কথাও জড়িত আছে। এক রাজা ছিলেন নাদ সাধক। নাদের চারটি ধ্বনি পুত্র। প্রথম পরা, দ্বিতীয় পশ্যন্তী, মধ্যমা তৃতীয় আর বৈখরী চতুর্থ। সেই নাদ বংশধর রাজার বংশেই সরস্বতী আবির্ভূতা, অর্থাৎ ধ্বনির বৈচিত্র্যই সংগীত সরস্বতী—বাঁশীর গান। শুনেছি বংশের মূল ভাগে বংশী, দ্বিতীয় ভাগে মুরলী, তৃতীয় ভাগে বেণু আর চতুর্থ ভাগে গোচারণের যষ্ঠি। এই বাঁশী মহাশক্তি, নাদই পরমসাধন, ধ্বনিই তার রূপ দেখায়। ঠাকুরের কথা শুনে ছেলেরা ত অবাক্। এমন করে বাঁশীর কথা তারা শোনেনি।

(৯)

কথকঠাকুর কখন যে কিভাবে থাকেন বোঝা বড়ো শক্ত। খাঁগিন্নী ধরে বসলেন, ঠাকুর কঠিন কথা বুঝি না। সোজা করে পারিজাত হরণের কথাটা আমাদের বলুন। ঠাকুর বলেন—আরে সে কথা আর কি বলব। নারদ গিয়েছিলেন ইন্দ্রপুরীতে। দেবরাজ ইন্দ্র দেবর্ষিকে পারিজাত পুষ্প উপহার দিলেন। যত্ন করে সেই পুষ্প নিয়ে এসে দেবর্ষি দ্বারকায় রুক্মিণীকে দান করলেন। তিনি কৃষ্ণের আজ্ঞা নিয়ে নারদের দেওয়া ফুলটিকে সযত্নে নিজের কবরীতে ধারণ করলেন। দেবীর শোভা, পুষ্পের মাহাত্ম্য বিচার করে নারদ বলেন, এই ফুলটি এক বৎসর পর্য্যন্ত

অম্লান থাকবে। এর গন্ধ অভিনব। দেবী আপনি সকলকার পূজনীয়া। এই পুষ্প ধারণে সকল সৌভাগ্য লাভ করা যায়। কোনও অভিলাষ অপূর্ণ থাকে না। ক্ষুধা পিপাসা ইচ্ছামত হয়। পার্বতী, অদিতি, শচীদেবী প্রভৃতি দেবীগণ ভিন্ন আর কেউ এটা ধারণ করতে পারে না। রুক্মিণীর ভাগ্যের কথা সত্যভামা জানলেন। দাসদাসী সকলেই দ্বারকায় পারিজাতের রহস্য আবিষ্কারে মুখর হয়ে উঠল। কেউ বলে নারদ একটি ফুল এনেছেন ঝগড়া বাঁধাবার জন্যে। অপরে বলে—নারদের দোষ কি? তিনি ফুলটি কর্তাকে দিয়েছিলেন। কর্তা যাঁকে ভালোবাসে তাঁকেই দেবেন। আবার কেউ বলেন—তবে যে শুনি, সত্যভামাকেই তিনি সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন। তার ত কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। কার্যে প্রমাণ হল রুক্মিণী দেবীকেই কৃষ্ণ অধিক প্রীতি করেন। যুক্তি বিচার কোনটাই সত্যভামার অজানা রইল না। তিনি প্রতিটি কথায় নিজের অপমান বোধ করছিলেন। তিনি মানগৃহে প্রবেশ করলেন। বস্ত্র, অলংকারাদি পরিত্যাগ করে তিনি ভূমিতলে লুণ্ঠিতা। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার ক্রোধের কথা জেনে সত্যভামার মন্দিরে এলেন। গৃহে প্রবেশ করে দেখেন, সত্যভামা ভূলুণ্ঠিতা। ধীরে ধীরে কাছে এসে হাতপাখাটি নিয়ে হাওয়া করতে থাকেন। কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে পারিজাত গন্ধ মিশেছিল। সেই গন্ধ পেয়ে সত্যভামা চোখ মেলে দেখেন কৃষ্ণ। তিনি চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠেন। আর এখানে কেন? আমায় অত অপমান দিয়ে মান কেড়ে নেওয়া কি করে সহ্য হয়? মনে হয় প্রাণত্যাগ করি। জানি না—তোমার কি কপটতা। কেন আমায় এমন করে বঞ্চনা কর। কৃষ্ণ বলেন—আমি ত

রুক্মিণীকে ফুল দিই নি। দেবর্ষি দিয়েছেন। মাত্র একটি পারিজাতের জন্য তোমার এই খেদ? তুমি মান ত্যাগ করো। তোমার অভিলাষ হলে আমি বৃক্ষ পর্য্যন্ত এনে তোমায় দেবো। সত্যভামা উঠলেন। কৃষ্ণ কথায় বিশ্বাস করেন তিনি। বলেন—চল তবে নন্দন কাননে।

যথাসময়ে কৃষ্ণ সত্যভামাকে নিয়ে স্বর্গে নন্দনকাননে উপস্থিত। বিহগ কাকলিতে মুখরিত কানন পারিজাত কুসুমামোদিত স্বর্গের উদ্যান। প্রিয়তম সঙ্গে সত্যভামা আনন্দে কুসুম চয়ন করেন। এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র শচীদেবীর সঙ্গে সেই কাননে প্রবেশ করলেন। দেবরাজ একটু আড়ালে ছিলেন। শচী দেবী সত্যভামাকে বললেন—একি! এখানে আবার তোমরা কি করে এলে? তোমাদের কে এখানে নিয়ে এল? এ যে দেবতার দুর্লভ স্থান। তোমরা মানুষ হয়ে এখানে কেন এসেছ? পারিজাতে তোমাদের অধিকার নেই। সত্যভামা বলেন—তুমি কোন সাহসে এ কথা বলছ? জান না কি আমার প্রভুর সভায় ইন্দ্র বরুণ সকল দেবতা গিয়ে পূজা দেয়? কথায় কথায় দুজনের বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চললো। কৃষ্ণ গতিক বুঝে সত্যভামাকে নিয়ে ফিরে এলেন। সত্যভামা বলেন—এমন করে অপমান সহ্য করে পারিজাত বৃক্ষ না নিয়ে চলে আসাটা কি উচিত হলো? শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—বিরোধ না করে শান্তির পথে আনা যায় তো মন্দ কি? ঠাকুর বলেন—কৃষ্ণ চিরকালই শান্তির কথাই আগে বলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাঁধাবার আগেও তিনি শান্তির দূত হয়েই এগিয়েছিলেন। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে তিনি অস্ত্র ধারণ করেন না।

এটা স্বভাবসুন্দর তাঁর প্রকৃতি। দেবর্ষি নারদকে কৃষ্ণ স্মরণ করলেন। দেবর্ষি আর কি করেন, ছুটে এলেন সুধর্মা সভায়। পাত্র মিত্র নিয়ে বসে আছেন কৃষ্ণ। আদর-যত্ন করে কৃষ্ণ বসালেন তাঁকে উচ্চ আসনে। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে তাঁকে খুব করে মিষ্টান্ন খাওয়ালেন। নারদ বলেন—খুব খেলাম। এরকম খাওয়া অনেকদিন হয় নি। দেখা যাক্ ইন্দ্রপুরীতে আবার কি রকম খাওয়াটা হয় সেখানে আমার নিমন্ত্রণ। এখান থেকে সোজা অমরাবতীতেই যাচ্ছি। কৃষ্ণ দেবর্ষি নারদকে অনুরোধ করেন—ঠাকুর, আপনি দেবরাজকে উৎসবের পরে আমার একটি কথা নিবেদন করবেন। বলবেন—তাঁর ভ্রাতৃবধূ সত্যভামা পুণ্যক ব্রত করছেন। এরজন্যে তাঁর প্রয়োজন একটি পারিজাত বৃক্ষ। এই বৃক্ষটি আপনিই তাঁর কাছে থেকে নিয়ে আপনি দেবেন। নারদ উত্তরে বলেন—বলব আমি সব, কিন্তু সে হয়ত দেবে না। কেননা, শঙ্করকে দেয় নি। দেবীর ব্রতের জন্য শঙ্কর নিজে একটি পারিজাত বৃক্ষ তৈরী করতে বাধ্য হয়েছেন। ইন্দ্রের এখন কত মান। বৃত্তাসুর বধ করেছে। সে আর কাউকে কিছু গণনা করে কি। কৃষ্ণ বিনীত ভাবে বলেন—সবই সত্য কিন্তু আমি তার ছোট ভাই ত। যদি না দেয় বলবেন, আমাকে জোর করেই আনতে হবে। আমার বাক্য কখনও অন্যথা হয় না। দেবরাজ ইন্দ্র শচীর সমীপে সত্যভামার সংগে বিরোধের কথা শুনেছেন। মানুষ হয়েও কৃষ্ণ কেন স্বর্গের পারিজাত চায়? এই বিষয়ে ইন্দ্রের হৃদয়েও অসন্তোষের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। সেদিন ছিল শিবের উৎসব। স্বর্গের দেবতারা শিবকে নিয়ে খুব নাচানাচি করছিল। নিমন্ত্রিত অতিথি

দেবর্ষির আগমনে তাঁরা সম্ভ্রমে তাঁকে অভিনন্দিত করে। দেবরাজ, তাঁকে বিশিষ্ট আসনে বসবার জন্য অনুরোধ করলেন। দেবর্ষি বলেন—একটি বিশেষ কথা বলবার জন্যে আমি এলাম। কথাটা আগে বলি তারপর বসব। দেবতারা সব নারদের বক্তব্য শুনবার জন্য আগ্রাহান্বিত। দেবরাজ উৎকর্ণ। কি সংবাদ নিয়ে এলেন নারদ। দেবর্ষি বলেন—আমি এলাম দ্বারকা থেকে। ইন্দ্র বলেন বুঝেছি, বুঝেছি। আপনি বসুন। সব ভালো আছে ত? হ্যাঁ, পারিজাত কাননে এসেছিল সত্যভামাকে নিয়ে, কিন্তু স্বর্গের সর্বজন পূজনীয়া শচীদেবীকে সত্যভামা অপমান করেছেন। এই অপমান অসহ্য। কৃষ্ণ কি জানে না মানুষের পারিজাত ভোগ সম্ভব নয়? যাগযজ্ঞ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করে মানুষ স্বর্গ সুখ লাভ করে। অনায়াসেই যদি তারা স্বর্গের পারিজাত করতলগত করতে পারতো তাহলে আর যাগযজ্ঞের প্রয়োজন কি ছিল? দেবর্ষি ইন্দ্রের মতলব বুঝে বলেন—দেবরাজ শুনুন, কৃষ্ণ বলেছেন প্রীতি পূর্ব্বক যদি পারিজাত দেওয়া না হয়, ওটা বল পূর্ব্বক কেড়ে নেওয়া হবে।

কথা শুনে ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি বলেন—তাকে বলে দেবেন, খাণ্ডববন দহনে, গোবর্দ্ধন ধারণে, বৃত্তাসুর বধের ব্যাপারে, কৃষ্ণ আমার প্রতিকূল আচরণ করেছেন। স্ত্রী বাক্যে মুগ্ধ কৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাকে অপমানিত করেছে। সে পারিজাত পাবে না।

দেবর্ষি একবার স্বর্গে একবার দ্বারকায় গমনাগমন করে বিরোধটিকে ফেনিয়ে তুললেন, দেবগুরু বৃহস্পতি অনেক বোঝালেন ইন্দ্রকে, সন্ধি করে নিলেই ছিলো ভালো।

রৈবতক পর্ব্বতে এসে কৃষ্ণ সাত্যকী সত্যভামা সংগে নিজরথে স্বর্গের পথে চললেন। অপরদিকে প্রত্যুম্ন নন্দন-পর্ব্বতে কাননে প্রবেশ করে পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করে অল্প সময়ের মধ্যে নিয়ে গেলো।

জয়ন্ত সাত্যকী দুই পক্ষে প্রধান প্রধান। প্রত্যুম্নও আছেন, চারিদিকে মার-মার, কাটকাট ধ্বনি উঠলো। ইন্দ্র বলে, আমি যুদ্ধ বিনা পারিজাত দেব না। এদিকে কৃষ্ণত নেবেনই। কাজেই উভয় পক্ষের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠলো। আমরা শুনেছি রাম-রাবণের যুদ্ধের তুলনা নাই। এদিকে ইন্দ্র ও কৃষ্ণের যুদ্ধের নমুনাও বড়ো কম নয়। ইন্দ্র যখন অনন্যোপায় হয়ে গরুড়কে লক্ষ্য করে বজ্র নিক্ষেপ করলেন, বজ্রের আঘাত সহ্য করে গরুড় তার একটি পক্ষ ত্যাগ করলো। সন্ধ্যা হয়ে গেলো। আবার পরের দিন যুদ্ধ হবে বলে যুদ্ধের বিরাম। পরের দিন সকালবেলা যুদ্ধক্ষেত্রে আবার দুইপক্ষের সৈন্যগণ যখন মিলিত হলেন, শঙ্কর মধ্যস্থ হয়ে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করলেন। এলেন অদিতি, এলেন কশ্যপ, এলেন অন্যান্য দেবতা। মাতা অদিতির বাক্যে ইন্দ্র শান্ত হলেন। তিনি আশ্বাস দিলেন—পারিজাত এক বৎসরকাল দ্বারকায় থাকুক তারপর আবার নন্দন কাননে ফিরে আসবে।

দ্বারকায় পারিজাত রোপণ উৎসব আজকাল বন-মহোৎসব নয়। সেদিন দ্বারকার সকল বন্ধু বান্ধব মণ্ডলীবদ্ধ হয়ে বৃক্ষটিকে যত্নের সহিত অভিনন্দিত করলেন। সকলেই সন্তুষ্ট। মর্ত্যলোকে স্বর্গীয় বৃক্ষ এই পারিজাত। সকলকার আগে বরণ ডালা নিয়ে

এলেন সত্যভামা। তারই আগ্রহে এই বৃক্ষ লাভ হয়েছে অতএব তার গৌরব অধিক। বহু লোক খাওয়ান দাওয়ান খুব উৎসব চললো। ইতিমধ্যে দেবর্ষি নারদ এলেন। সত্যভামাকে অন্তরালে ডেকে এনে পুণ্যকব্রতের উপদেশ দিতে লাগলেন।

নারদ বলেন—দেবী, সকলের চাইতে পতির অধিক প্রিয় হতে হলে একটি ব্রত করা দরকার। সেই ব্রতের কথা তোমায় বলতে এসেছি। সেই ব্রতের নাম পুণ্যক ব্রত। একমাস, ছমাস বা তিনমাস ধরে এ ব্রত করতে হয়, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে এই ব্রতের জন্য প্রশস্ত, উমা, অদিতি, শচী, অরুন্ধতী প্রভৃতি পতিব্রতাগণ এই ব্রত করেছেন। ব্রতচারিণী বৎসরাবধি নিয়ম পালন করবেন আর ব্রত উদ্‌যাপনের দিনে স্বর্গ নির্মিত চন্দ্র-সূর্য ব্রাহ্মণকে অর্পণ করবেন। এ ব্রতের অনেক ফল। স্বর্ণ বিল্ব, স্বর্ণ কূর্ম, জলদান অন্নদান বহুপ্রকার দানের ব্যবস্থা আছে। তবে একটা কথা বলি —ব্রতের পর যদি স্বামীকে বৃক্ষে বন্ধন করে ব্রাহ্মণকে উৎসর্গ করা যায় তাহলে পতি সেই নারীর একান্ত বশীভূত হয়ে থাকে।

সত্যভামা বলেন—দেবর্ষি, আমার স্বামীকে যাই বলি তিনি তাই স্বীকার করেন। আমাকে পুণ্য ব্রত করান।

ব্রত আরম্ভ করান হলো, কত দ্রব্যের আয়োজন। বহু লোকের নিমন্ত্রণ, অবিচারে ব্রাহ্মণ ভোজন। বস্ত্র-অলংকার অর্থাদি দান। সত্যভামা নিয়ম করে পুণ্যক ব্রত উদ্‌যাপন করবেন। দ্বারকাপুরীর সকলেই সন্ত্রস্ত। একবৎসর ধরে যে বাড়াবাড়ি চলেছে উদ্‌যাপনের শেষ রক্ষা হলে হয়। সেদিন কৃষ্ণকে পারিজাত কুসুম মালায় ভূষিত করে তাকে মন্ত্র পড়ে নারদকে দান করা হলো। নানা মণি,

রত্ন, সুবর্ণ ত সঙ্গেই আছে। নারদ হৃষ্টচিত্তে ওঁ স্বস্তি বলে ধন-রত্ন সহ কৃষ্ণকে গ্রহণ করে বল্লেন—ভো কেশব মদীয়স্ত্বমদ্ভির্দত্তোহসি কৃষ্ণয়া। স ত্বং মামনুগচ্ছস্ব কুরু যদ্ যদ্ ব্রবীম্যহং, আমার এই বীণাটি কাঁধে করে নেও। মোটঘাট সঙ্গে নিয়ে আমার সাথে চলো। কৃষ্ণ একবার দেবর্ষির দিকে, একবার সত্যভামার দিকে চেয়ে মোটঘাট সহ বীণাটি কাঁধে করে নারদের অনুগমন করছেন। সত্যভামা ছুটে গিয়ে নারদের কাছে বলছেন—দেবর্ষি! একি! এই কি আমার পুণ্যক ব্রত? আমার প্রভুকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? ঋষি বলেন—মাঠাকরুন, এইমাত্র মন্ত্র পড়ে কৃষ্ণকে যে আমায় দান করলেন, কৃষ্ণ যে এখন আমার। সত্যভামা কান্না জুড়ে দিলেন, "তোমরা দেখে যাও গো, নারদ আমার কৃষ্ণকে নিয়ে যায় তোমরা কে আছ আমার কৃষ্ণকে রক্ষা করো"। রুক্মিণী দেবী ছুটে এলেন—তিনি বলেন, ঠাকুর এ আবার কেমন ব্রত? কৃষ্ণ হারাতে হয়? আর দেখুন কৃষ্ণ ত সত্যভামার একার নয়, একা সত্যভামা দান করলেই কৃষ্ণ আপনার হয়ে যেতে পারে না। বরং বলুন—আপনি কি চান? আমাদের কৃষ্ণকে আমাদের কাছেই থাকতে দিন। দেবর্ষি বলেন—একটি মাত্র উপায় আছে। তুলা দণ্ড নিয়ে আসা হউক। কৃষ্ণের পরিমাণ সুবর্ণাদি মণি দান করলে আমি কৃষ্ণকে তোমাদের হাতে দিতে পারি। তখন মহিষীগণ সকলে মিলে আপন আপন স্বর্ণ অলংকার স্তূপীকৃত করতে লাগলেন। কৃষ্ণ আর কত ওজন হবে। কৃষ্ণ যদি আমাদের হয় তবে এই সকল অলংকার তুচ্ছ। তুলাদণ্ডের একপাশে কৃষ্ণ বসছেন। অপরপার্শ্বে রত্ন অলংকার দেওয়া হলো। একে একে

কত অলংকার দেওয়া হয় কৃষ্ণের সমতুল ত হয় না। স্তূপীকৃত রত্নালংকারেও কৃষ্ণকে পরিমাপ করা গেলো না। তখন সকলেই চিন্তান্বিত। উপায় কি? দ্বারকার পরিজন সকলে এলেন, কে একজন বলে উঠল—বুঝি উদ্ধবই হবে—নাম ছাড়া নামীর সমান আর কেউ নয়। নাম নামী অভিন্ন। নামী হতে নাম বড়ো। একটি তুলসী পত্রে নাম লিখে সমস্ত অলংকারাদি নামিয়ে রেখে সেই তুলসী পত্রটি তৌল যন্ত্রের অপর পার্শ্বে দেওয়া হল। দেখা গেলো কৃষ্ণ ওপরে উঠে গেছেন, নামের দিকটা ভূমি স্পর্শ করেছে। নাম নামীর চাইতেও গুরু প্রমাণিত হয়ে গেল। শাঁখ বাজল, কৃষ্ণ মুক্তি পেয়ে গেলেন। নারদ কিন্তু সেই নাম লেখা তুলসীটি পেয়ে মস্তকে গ্রহণ করে পরমানন্দে নাচতে লাগলেন, বললেন—আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি। নামীর চেয়ে বড় নাম পেয়েছি। ঠাকুর গান ধরলেন—

বল্ রে ভুবনমঙ্গল নাম (এ যে) শ্রবণে মধুর,
এ নাম প্রেমামৃত—রসপুর ॥ (হরিবোল হরিবোল)
    এ নামে আছে এমনি সুধা
(ইথে) মিটায় বিষম বিষয়-ক্ষুধা,
    তৃষিতের তাপ-তৃষ্ণা করে দূর—
হরিবোল যে বলে তার গোল ঘুচে যায়,
    (ও তার) হৃদে জন্মে প্রেমাঙ্কুর ॥
যদিও সে নাম-নামী,
অভিন্ন তবুও শুনি,
    হরি হ'তে হরিনামের মহিমা প্রচুর—

ও তার সত্যভামা জানি তত্ত্ব
কৈলেন নিজ ভ্রান্তি দূর ॥
শ্রবণে মধুর ॥

ঠাকুর কিছুদিন দেশে ছিলেন না। শুনলুম দক্ষিণে গিয়েছিলেন। বাইরে থেকে এসে তিনি ভালই আছেন। জগদ্ধাত্রী পূজোপলক্ষে বোসেদের বাড়ী তাঁর কথকতা হবে সাত দিন। গ্রামের আবাল বৃদ্ধ সকলেই আগ্রহান্বিত। কবে সমরেশ বোসের বাড়ী কথা হবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে শাঁখের ধ্বনির সঙ্গে ঠাকুরের আগমন বার্ত্তায় এপাড়া ওপাড়া সকল গৃহের কুলবধূটি পর্যন্ত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। অনেকদিন পর আবার তারা কথা শুনতে যাবে। সন্ধ্যায় কীর্ত্তন আরম্ভ হল।

যথাসময় ঠাকুর মঙ্গলাচরণ করে গান ধরেন—

পরম দয়াল ওহে সাধুগণ
করুণা কর অকিঞ্চনে
ঘুচাও ভ্রান্তি ত্রিতাপ অশান্তি
মাতি হরি গুণ কীর্ত্তনে।
সাধন সুকৃতি সঙ্গতি হীন
কলি হত জীব পাপেতে মলিন
কৃতকর্ম ফল ভুঞ্জিতে কেবল
পড়িয়া এ ভব বন্ধনে ॥

গানটি শেষ না হতেই চারিদিকে ঠাকুরের ভক্তগণ হরিধ্বনি করে উঠলেন। ঠাকুর বলেন—এবার দক্ষিণ দেশে গিয়ে যে সব ভক্তের মহিমা স্বচক্ষে দেখে এলাম তা আর কি বলব? আমরা শুনেছি

শ্রীকৃষ্ণের এক ভক্ত ছিলেন সুদামা। দক্ষিণ পশ্চিমে সমুদ্রের ধারে সেই প্রসিদ্ধ সুদামাপুরীও এবার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। ভক্তের মহিমা ভগবানই জানেন। সুদামা কি ছিল আর কি হল।

ভারী দরিদ্র ব্রাহ্মণ বেচারা। কোনো উপায় নেই। প্রতি-নিয়ত অভাব লেগেই আছে। একদিনও ব্রাহ্মণীর তাগিদের কামাই নেই। আজ চাল বাড়ন্ত। কাল তেল নেই। পরের দিন বস্ত্র নেই, আরো কত কিছু নেই। ব্রাহ্মণ বসে আছেন কোনো রোজগারতো নেই। বসে থাকেন আর ভাবেন পারের কাণ্ডারী এমন দরিদ্রকে বিনা কড়িতে পার করবেন কি? সাধন ভজনই বা এমন কি? তবে তিনি হিংসিত হলেও হিংসা করেন না, এটা একটা গুণ তাঁর। ব্রাহ্মণ সুদামা সর্বদা পরলোকের চিন্তা করেন অতএব শান্ত। খাওয়া দাওয়ার প্রাচুর্য নেই, মনে হয়, সেই অভাবে শরীর জীর্ণ শীর্ণ মুখ মলিন আর ইন্দ্রিয়ের লালসাও নেই। ক্রোধ আর কার উপর করবেন তিনি? নিজের ভাগ্য চিন্তা করে অক্ষুব্ধ ভাবেই দিন যাপন করেন। ব্রাহ্মণী কিন্তু প্রায় বলে— ঠাকুর তুমিতো বলেছ দ্বারকার অধিপতি কৃষ্ণ বাসুদেব। তোমার অবন্তিনগরে সান্দীপনী মুনির বিদ্যালয়ে পড়বার সময় সেখানে অল্পদিনের জন্য হলেও কৃষ্ণ তোমাকে বন্ধু বলে বরণ করেছিলেন। একবার সেই পুরাণ বন্ধুটির সঙ্গে গিয়ে দেখা কর না? তাঁর একটু নজর পড়লে তোমার কোন্ অভাব থাকবে? শুনেছি সে নাকি খুব দয়ালু। যাওনা একবার দ্বারকায়। অনেক অভাব, প্রতিদিন তাগিদ আর সহ্য হয় না। ব্রাহ্মণ সুদামা ভাবেন— আমার জন্য কোনো কিছু প্রয়োজন নেই। ব্রাহ্মণীকে তো কোনদিন

সুখী করতে পারিনি। তার কথামত গিয়ে দেখিনা দ্বারকায় কোনো উপায় হয় কিনা? আর কিছু না হ'ক একবার সেই পরম সুন্দর বাসুদেবকে দর্শনও তো হবে। সুদামা বলেন—ব্রাহ্মণি। তোমার কথামত আমি যাব দ্বারকায়, তবে বন্ধুর কাছে শুধু হাতে যাওয়া শোভা পায়না। যদি কিছু থাকে দাও না সঙ্গে নিয়ে যাই। ব্রাহ্মণীব ঘরে নিত্যই অভাব, কি আর থাকবে? অপরের ঘরে চেয়ে চারমুষ্টি চিড়ে পেলেন, মলিন ছিন্ন বস্ত্র ক্ষুৎক্ষাম শীর্ণ শরীর ব্রাহ্মণ তার বস্ত্রাঞ্চলে বেঁধে দিলেন ব্রাহ্মণী সেই কটি চিড়ে। এ নিয়ে আবার বন্ধুর বাড়ী যায়? ব্রাহ্মণ পথে চলেন আর গান করেন—

এবার রাখ পদে বিপদবারণ।
আমার সাধন ভজন সহায় সম্পদ
সকল তোমার রাঙ্গা চরণ।
ও হে অনাথশরণ আমি চাহিনা অন্য ধন
তোমাধনে ধনী হয়ে জুড়াব জীবন—
আমার এই বাসনা যেন সদা থাকি তোমাতে মগন।

পথিকের ভাব বিহ্বল অবস্থা দেখে কত লোক তার সঙ্গে চলে। তারাই তাকে পথে খাদ্য পানীয় দেয়। ব্রাহ্মণের আর কোনো দিকে দৃষ্টি নেই সে শুধু গান গেয়ে যায়—

ওহে অগতির গতি করি পদে মিনতি
বিপদে সম্পদে মতি রয় তোমা প্রতি—
কুকার্য সাধিতে মতি যায় না হে মধুসূদন।
পড়ে অকূল পাথারে ডাকি তোমায় কাতরে

তোমা বিনে এ দুর্দিনে বল কে তারে—
দিয়ে চরণতরী কৃপা করি
তরাও হে দীনশরণ।

সুদামার উৎকণ্ঠায় দূরের পথ খুব কাছে হয়ে গেল। দ্বারকা-পুরীর দ্বারে এসেছে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ। কি বিরাট তোরণ একটির পর একটি-বৃহৎ কবাট, শৃঙ্খল, দ্বার, প্রহরী, কি সে ঐশ্বর্য্য! উদ্যান, চত্বর, শোভা, পতাকা, বন্দনবার, মঙ্গল ঘট, ঘৃত প্রদীপ, গন্ধ জল ছড়ানো পথ! ব্রাহ্মণ যে এমন একটা রাজপুরীর মধ্যে আবিষ্ট-ভাবে প্রবেশ করেছে সেটা সে ধারণাই করতে পারেনি। কই কেউ তো তাকে বাধা দেয়নি? কেন প্রহরীগণ তাকে অনায়াসে পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দিয়েছে। বুঝি এখানকার প্রহরীদের প্রতি নির্দেশ আছে, 'যাঁরা দীন হীন সাধন পরায়ণ হরিগুণ গান নিরত' তাদের রাজপুরীতে নির্বাধ প্রবেশ অধিকার। তাঁরা সাধু ভক্ত সজ্জন, তাঁদের কেউ বাধা দিও না, সুধর্মা সভার প্রবেশ পথে। নিত্য কত অচেনা সাধু আগমন করেন শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে এই দ্বারে। কৃষ্ণ ভগবান নিত্য তাদের আদর করেন কত ভাবে।

সুদামা তিন স্থানে প্রহরী ও তিনটি পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গন পার হয়ে বহুগৃহ সমাকীর্ণ রাজপুরীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ গৃহে প্রবেশ করছিলেন।

ব্রাহ্মণ জানেন না এটি শ্রীরুক্মিণীর মহল আর সেখানেই স্বর্ণখাটের উপর অর্ধশয়ানে ছিলেন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। দূর থেকে সুদামাকে দেখে কৃষ্ণ ছুটে এলেন আর বাহু প্রসারিত করে

আলিঙ্গন করেন সেই ধূলিমাখা মলিনবস্ত্রধারী ক্ষীণশরীর ব্রাহ্মণ সুদামাকে। চারিদিকে দাস দাসী পরিজন বিস্মিত হয়ে থাকে শ্রীকৃষ্ণের এই মিলন-মাধুরী উপভোগ করে। ব্রাহ্মণ ভাবেন একি—আশ্চর্য-প্রেম! কোথায় আমার মত এক অতি দীন মলিনদেহ ব্রাহ্মণ আর কোথায় দ্বারকার অধিনায়ক সর্বেশ্বর পরম সুন্দর সর্বৈশ্বর্য্যের অধিকারী কৃষ্ণ বাসুদেব। কি তাঁর উদারতা কি তাঁর ব্যবহার।

রুক্মিণী দেবী কিছু বলবার পূর্বেই প্রভুটি ছুটে এসেছেন তাঁর সখাকে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাতে। কৃষ্ণ বলেন—স্বর্ণ ভৃঙ্গারে জল নিয়ে এস, ব্রাহ্মণের পদ ধৌত করতে হবে। ততক্ষণ কৃষ্ণ সুদামাকে নিজের পর্যঙ্কে বসিয়ে পদ ধৌত করবার জন্য প্রস্তুত। দেবী রুক্মিণী জল ঢেলে দেন আর কৃষ্ণ নিজে হাতে ব্রাহ্মণের পদ ধৌত করে দেন। ধন্য ব্রহ্মণ্যদেব। তাইতো জগতের বরেণ্য তুমি! এমন বিনয় না হলে কি সর্ব্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হয়।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।

সুদামা পূজা পেয়ে সঙ্কুচিত আর শ্রীকৃষ্ণ পরম আনন্দ লাভ করেন বন্ধুর সপর্য্যা করে।

কতদিন পর দুই বন্ধুর মিলন। একজন রাজা অপরজন ভিখারী। নানাপ্রকার কথায় কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের মনটাকে সঙ্কোচ-মুক্ত করবার চেষ্টা করছেন। প্রথমেই কথা হল সেই গুরুকুল-বাসের। কৃষ্ণ বলেন—মনে পড়ে সেই সেদিনের কথা? যে দিন কাষ্ঠ আহরণ করতে গিয়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশতলে ঘন-বনে অন্ধকার

হয়ে গেল। ঘরে ফিরবার পথ হারিয়ে গেল। আর সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়বৃষ্টি কত দুর্যোগ। গুরুদেব আমাদের খুঁজে সেই বনের পথে এসে আমাদের ঘরে নিয়ে যান। সে দিন বেশ বুঝেছিলাম, গুরুদেব আমাদের কত ভালবাসেন। বিপদের মুখে রক্ষা করতে গুরুদেবের কত আকুলতা। রাজবাড়ীর খাওয়া স্বর্ণথালায় চতুর্বিধ অন্ন পরিবেশিত হল। চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানাপ্রকার পিষ্টক লড্ডুক কত সব সামগ্রী সাজানো হয়েছে। এক্ষুণি খাওয়ার ডাক পড়বে।

কৃষ্ণ কিন্তু কথায় কথায় সুদামা বিবাহ করেছেন কিনা—গার্হস্থ্য জীবনের সুখ দুঃখ নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করে বলেন—তবেতো আমার বন্ধুপত্নী নিশ্চয় আমার জন্য কিছু উপহার পাঠিয়েছেন। কথা শুনে কিন্তু সুদামা তার বস্ত্রে বাঁধা চিড়ের পুঁটুলি লুকাচ্ছিলেন। কৃষ্ণ বলেন—ও কি বন্ধু, কাপড়ে কি বাঁধা আছে আমাকে দেবে না? আমি তবে নিজে হাতেই খাবো। বলার সঙ্গে সঙ্গে চিড়ের পুঁটুলি থেকে এক মুষ্টি চিড়ে নিয়ে গালে দিলেন। ব্রাহ্মণ বলে—না বন্ধু ঐ সামান্য চিড়ে তোমার খাদ্য হতে পারে না। কৃষ্ণ বলেন—সে কি, এমন উপাদেয় খাদ্য অনেকদিন খাইনি। দাও আর এক মুষ্টি খাবো। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণী-দেবী হাত ধরে মিনতি করেন, প্রভু আর নয়, এক গ্রাস খেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছ, তাতেই ব্রাহ্মণের সকল ঐশ্বর্য্য সিদ্ধি হয়েছে আবার যদি আরো এক মুষ্টি খাও, তবে আমি পর্যন্ত ব্রাহ্মণের কাছে বাধা পড়ে যাবো। আর নয় প্রভু ক্ষান্ত হও।

দুই বন্ধু বসে নানাপ্রকার সুখাদ্য সুপেয় সেবা করে সেদিন এক

শয্যাতেই শয়ন করলেন। রুক্মিণী দেবী ভিন্ন মন্দিরে রাত্রি যাপন করলেন। বন্ধু প্রীতির পরম আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। সুদামা তাঁর ভাব মাধুর্য্যে ডুবে রইলেন। সব কিছু ভুল হয়ে গেছে প্রাণবন্ধুর সান্নিধ্যে। কৃষ্ণ সারাক্ষণ কত কথা বলেন, বলান ,কিন্তু সুদামা যে জন্য এসেছেন সেই ধনলাভের প্রার্থনার কথা আর কোনোমতে তার রসনায় আসেনা।

সকাল বেলা যাবার সময় হল। ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের হাত ধরে আদর জানিয়ে বিদায় নিচ্ছেন। আনন্দে তার মুখমণ্ডলে অপূর্ব দীপ্তি, চোখ ভরা জল, আর কোনো কথা যেন বলতে পারছেন না। কৃষ্ণ-ভাবছেন—বন্ধুপত্নী যে কামনা করে ব্রাহ্মণকে এখানে পাঠালেন তারতো কিছুই হলনা, সত্যই আমার মত অকৃতজ্ঞ বুঝি আর কেউ নয় ? আব এই ব্রাহ্মণকে যদি আমি হাতে তুলে কিছু দান করি তবেতো আমাদের দুজনেব মধ্যে সখ্যভাবে যে সমতাবুদ্ধি আছে তার অমর্য্যাদা হয়। প্রার্থী ও যাচকের সম্বন্ধ হয়ে যায়। এরূপ অসম্মান আমার বন্ধুর হতে দেবনা। আমি দাতার গৌরব নিতে চাইনা। অযাচিতভাবে তাকে কিছু দিলেও পক্ষপাতিত্ব হয়। যাক্ আমিতো তার দেওয়া চিড়ে খেয়েছি—তার বিনিময়েও তো কিছু সে পেতে পারে ? কাকে বলি এর সমাধান করে কে ?

ভগবান সত্যসঙ্কল্প তাঁর লীলাশক্তি সর্ব্বদা তাঁর লীলার সর্বপ্রকার সমাধান করে থাকেন।

ব্রাহ্মণ সুদামা গৃহের দিকে অগ্রসর হলেন। গ্রামটা যেন কোন্ অজানা প্রকৃতির মোহন স্পর্শে নতুন শোভায় শ্রীমণ্ডিত হয়েছে। ব্রাহ্মণের ভগ্ন কুটির আর দেখা যায় না। বরং

সেখানে বিরাট অট্টালিকা আর দাসদাসী পরিবৃতা নানা অলঙ্কারে ভূষিতা গৃহিণী সেই দরিদ্র সুদামারই পত্নী। ব্রাহ্মণ এক রাত্রিতে এই সকল পরিবর্ত্তন দর্শন করে বিস্মিত হলেন। তিনি আর কাউকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বুঝলেন এ সকলই সেই শ্রীকৃষ্ণ দয়াময়ের অচিন্ত্য লীলা। তিনি ভাবেন—হে অনন্তদেব, আমাকে তুমি তোমার মায়াময় সংসারের মোহে আর ভুলিয়ে রেখোনা। দিয়েছ তুমি ভোগের সামগ্রী নানা প্রকার ঐশ্বয সৌন্দর্য এসব যেন তোমার সেবায় নিযুক্ত রাখতে পারি আর আমাকে দাও শুদ্ধ মন, যেন তোমার অকৃপণ করুণা স্মরণ করতে পারি।

ঠাকুর আমাদের গান করেন আর চোখের জলে ভাসেন। প্রথমটা বুঝতে পারিনি কেমন করে হৃদয়ের একটা ভাব জল হয়ে গড়িয়ে যায়। ঠাকুরের মুখে নাম শুনে আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গান করে তখন সেটা একটু অনুভব হয়েছে। কত লোকের মুখেই শুনেছি নাম কর, নাম কর। হরি বল, কৃষ্ণ বল, রাম বল, সবই ঐ এক নামের মধ্যেই আছে। নামই ব্রহ্ম নামই সাধন এবং নামই সর্ব্বস্ব ধন। ঠাকুর কিন্তু আমাদের এ সব কথা কোনদিন বলেন-নি। কেবল তাঁর কথকতা শেষ করে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে হরিনাম করেছেন, আর আমরাও সঙ্গে সঙ্গে নাম উচ্চারণ করেছি।

লক্ষ্য করেছি, পূজা করতে বসে ঠাকুর কেমন আত্মহারা হয়ে যান। একদিন বলছিলেন—তুমি আমার প্রাণের দেবতা, তোমার লীলা, তোমার আবির্ভাব, তোমার করুণা বিলাস, তোমার দান, তোমার গ্রহণ, তোমার সত্ত্বা, তোমার বিস্তার, সর্ব্বত্রই যে আমার

একটু স্থান আছে—সে স্থান সম্বন্ধে আমার জ্ঞান থাকুক আর নাই থাকুক, তুমি তো নিজেই সেই স্থান আমার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছ। তোমার অংশ বলিয়া তো আমাকে অস্বীকার কর নাই। তোমার প্রকৃতি বলিয়া তো অঙ্গীকার করিয়াছ। চেতন সত্ত্বায় আমাকে বুবুক্ষা দিয়াছ, প্রেমসত্ত্বায় আমার অভীপ্সা জাগাইয়াছ। তোমার বিরাট সত্ত্বায় আমাকে নিত্যানন্দের দাবী করিতে শিখাইয়াছ। আমি তো অকৃতজ্ঞ নই। আমি কেমন করিয়া সাগরের তীরে কূপ খনন করিতে বসিব? তোমার আনন্দ উদ্বেল প্রেমসিন্ধুর স্পর্শ পাইয়া কেন আব আমি ঘৃণিত ডোবার জলের আশায় নাচিব। আমার অন্তরে দাও প্রেম-প্রেরণা, কণ্ঠে জাগাও তোমার মঙ্গল-বন্দনা। তোমার মহিমায় মণ্ডিত করিয়া আমাকে গ্রহণ কর।

লোকে বলে ভূতশুদ্ধি করিয়া পূজা করিতে হয়, ভূত অর্থে যদি প্রসিদ্ধ পঞ্চ-মহাভূত জল মাটি আকাশ বাতাস আর আগুন বুঝিয়া লই, তবে তো আমার ভাবনায় এই পঞ্চভূতে তাঁহার মহিম ভিন্ন তো আর কিছু নাই—থাকিতে পারে না। তাঁহার সৃষ্টিকে আর কোন মন্ত্রে শোধন করিব? ভূত অর্থে যদি প্রাণ হয় তবে তো তাঁহারই শক্তিধারক কোনো প্রাণী কোন মতেই অশুদ্ধ হইতে পারে না। অতএব ভূতশুদ্ধির ভাবনা আমাকে কখনো চঞ্চল করে নাই। আমি ভাবি আমি তাঁহারই তাঁহাতেই আছি আর তাঁহারই আছি। হে আমার বরণীয় দেবতা, তুমিই বল না তোমাকে ছাড়া আর আমার কোনো অস্তিত্ব আছে কি? না থাকিতে পারে? তবে আর শুদ্ধির কথা ওঠে কেন?

মন্ত্রোচ্চারণ পূজার সাধন। মন্ত্রেই জল মাটি সব কিছু শোধন করিতে হইবে। তীর্থ স্মরণ করিলাম, পুণ্য ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত গঙ্গা যমুনা, গোদাবরী, সিন্ধু, সরস্বতী, কেহ আর বাকী রহিল না। আজ পূজার চলে সকলের আহ্বান। যেখানে যে মাটী পবিত্রতায় প্রসিদ্ধ, যেখানে যে পুণ্য পূঞ্জীভূত, সেখান হইতেই মাটী আনা হইয়াছে। পুষ্প, পত্র, গন্ধ রস যাহারা দেবভোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে সকলকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। আসন বস্ত্র অলঙ্কার প্রসাধন দ্রব্য কোনটাই কম নয়। কিন্তু আমার মনের প্রসন্নতা দিবে কে? কোথায় সেই পূজারীর একনিষ্ঠ মন। শুধু কি বাহিরের সামগ্রীগুলিই পরমদেবতার তৃপ্তি বিধান করিবে? মন যে আমার বড়ই চঞ্চল। ঘণ্টা বাজে, কাঁসর বাজে, ঢাক ঢোল বিচিত্র বাজনার তালে তালে যে আমার দুরন্ত মনও নাচিয়া উঠিল। এই অশান্তকে শান্ত করিবে কে? হে আমার প্রাণের দেবতা, তোমার স্নিগ্ধতা আমার প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে আপ্যায়িত করুক। তোমার স্পর্শে আমার জীবন শান্ত হউক, তোমার পাদপদ্মে মদমত্ত হস্তীকে সংযত করিবার যন্ত্র অঙ্কুশ আছে, সেই অঙ্কুশে আমার মত্ত মনকে উন্নত কর। তোমার সৌন্দর্য্য আমার দৃষ্টিকে স্থিরীকৃত করুক, তোমার গন্ধে মুগ্ধ জ্ঞানেন্দ্রিয় যেন অপর গন্ধে উন্মাদিত না হয়। তোমার নির্মাল্য স্পর্শে আমার লৌকিক স্পর্শসুখ তুচ্ছ বলিয়া প্রতিভাত হউক।

সঙ্কল্প করি তোমার পূজা করিব। একদিনের জন্য নয়। জীবনব্যাপী পূজার আয়োজন। অনন্তের পূজা, অনন্ত উপহারে। দেবতার মিলন সঙ্কল্প। আদরে আদরে পাইব এই সঙ্কল্প।

তোমারই প্রীতির জন্য তোমার পূজা। আমার পাপ দূর কর। এ কামনা আমার নাই। শত জন্ম স্বর্গধাম, এ সংকল্প আমার নয়। ইহকাল পরকাল সর্বাবস্থায় তোমার সন্তোষ বিধান, জীবন মরণে তোমার প্রীতি, ইহাই আমার কাম্য। এই বিষয়েই শুভ সংকল্প। ইহাকেই 'শিব সংকল্প' বলিয়া বুঝিয়াছি।

মনের পূজাই বড় পূজা। আমার মনের বিস্তারে তোমার আসন পাতি। ঘৃতের প্রদীপ জ্বালাই, ধূপের গন্ধে আমোদিত হউক আমার গোপন মন্দির। ভাবের ফুল প্রেমের ডালায়, আদর চন্দন সেগুলিকে অধিকতর সুরভিত করুক। আমার বিচার-বৈরাগ্যের একতারা বাজিয়া উঠুক নিজ মহিমাময় সহস্র ঝঙ্কারে। বাহিরের কলরোল হউক বন্ধ। প্রাণের আড়ালে চলুক অভঙ্গ আনন্দ কীর্তন। দাও আমায় অনুভূতি। তোমার শুভদর্শন প্রত্যক্ষ হউক। তোমাকে চন্দন মাখাইয়া কি আমার শীতলতা অনুভব হইবে না? এস প্রিয়তম, তোমাকে চন্দন দিই! আমি চন্দন কোথায় লেপন করিব? আমি যে তোমার স্পর্শ পাইতেছি না। আমি যে শুধু একটা অন্ধের মত বৃথা অভিলাষ লইয়া হাত বাড়াইতেছি। তবে কি আমার পাপে আমার ছোঁয়ার বাহিরেই তুমি থাকিবে? আমি কি তোমাকে স্পর্শ করিবার যোগ্য নই? আমাকে তুমি পূজার অধিকার যদি দিয়াছ, স্পর্শের সুযোগ দাও। শুধু মন্ত্র আর স্তব স্তুতি—এই কি তোমার পূজা, তাহাতো হইতে পারে না: তোমার স্পর্শে গন্ধে আমায় পাগল করিয়া দাও। একটি বার আমার জীবনে সেই ভাব জাগাইয়া দাও যাহাতে আর তোমাকে ভুলিতে না হয়।